উত্তরে মেরু দক্ষিণে বন

কমল দাশ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
অবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১২ বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৬

উৎসর্গ

স্বর্গলোকে বাবা

ও ইহলোকে মা-কে

যাঁদের স্নেহমমতায় ছোট্ট কমলির মন

গড়ে উঠেছে—

এই লেখিকার—

জানা অজানা

অমৃতস্য পুত্রী

ছোট্ট কমলি মাঝরাতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে জানালার শিক ধরে।

আকাশের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে।

মনে আশা হ্যান্স যা দেখতে পেয়েছিল সেও তা দেখতে পাবে।

ছোট হলে কি হবে? সে কারও কথা মানতে রাজি না। সকলে বলে বাচ্চা হ্যান্স স্বপ্নের জগৎ বানিয়ে ছিল।

তা কখনও হয়? কমলি ভাবে সে ত পারে না এভাবে ভাবতে।

ওর ধারণা বড়রা শুধু ধাপ্পা দিতে জানে।

মাঝে মাঝে রাতে উঠে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিশ্চয়ই একদিন সে দেখতে পাবে ফ্লাইং ট্রাংক মেঘের ফাঁক দিয়ে নেমে আসছে কমলির জন্য। এবার আর সে রাজকুমারীকে নেবে না। নেবে কমলিকে।

'একি কমলি সোনা—আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিস?'

কখন যে বাবার ঘুম ভেঙে গেছে আর বাবা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন কমলি মোটেই টের পায়নি।

'জান বাবা, সবাই বাজে কথা বলে। আমি জানি হ্যান্স যা লিখেছে তার বেশীর ভাগই দেখেছিল।'

বাবা তার ছোট্ট মেয়েটার মনে আর আঘাত না দিয়ে বললেন, 'হবেও বা। আয়, এখন শুবি আয়।'

'তুমি জান না বাবা, আমি প্রায়ই উঠে দেখবার চেষ্টা করি। কিছু দেখতে পাই না। এখন আমি বুঝেছি, কেন দেখতে পাই না।'

'হ্যান্সকে তার বাবা-মা তেমন ভালবাসত না। বাসবেই বা কি করে? বাবা ছিল ভীষণ গরীব আর মা মাতাল।'

'তুমি আর মা যে আমাকে ভীষণ ভালবাসো। যখন যা চাই তাই দাও। সেইজন্য আমি দেখতে পাই না।'

'বোধ হয় তুই ঠিক বলছিস। সবাইত সব কিছু পায় না।'

'জান বাবা, আমি ভেবে ঠিক করেছি আর আমি মাঝরাতে উঠে দেখতে চাইব না।'

একটু থেমে কমলি বলল, 'তোমরা আমাকে ঠিক এইরকম ভালবেসো। ওসব আমার কিছু দরকার নেই। হ্যান্সের বই ত রয়েছে। তাই পড়ব।'

মনে পড়ে বাবা আদর করে জড়িয়ে ধরে শুইয়ে দিয়ে বলেছিলেন 'তাই হোক।'

সেই কমলি কমলে পরিণত হয়ে চলেছে হ্যান্সের দেশে। ছোট্ট কমলি কিন্তু মনের এক কোণে রয়ে গেছে বলেই ত মনে পড়ে গেল।

তিনজন তিনটি পাতলা স্যুটকেস হাতে নিয়ে লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম।

ট্রেনে উঠলেই আমার মনটা আনন্দে ভরে যায়। প্লেনে বা স্টীমারে সেই আনন্দ পাই না।

ছোটবেলা থেকেই জানালার পাশে বসে বাইরের ছুটন্ত দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও এখানে সেখানে চলে গেছে। যা দেখছি তাতো আছেই। যা দেখবার আশা রাখি, যা কোনদিন দেখতে পাব না সবই একের পর এক চোখের সামনে সিনেমার মত ভেসে উঠে মিলিয়ে গেছে। আশ্চর্য মনে হোল। মানুষের বয়স বাড়ে, বাইরের থেকে পরিবর্তন আসে, আজ যে বালিকা, কাল সে তরুণী, পরশু সে প্রৌঢ়া, তারপরে বৃদ্ধা।

কিন্তু মন? তা বুঝি একই থেকে যায়। না হলে সেই ছোটবেলার মনটাই ত আবার নড়ে চড়ে উঠল। সেই অনুভূতি।

ডোভারে স্টীমারে উঠলাম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেবার জন্য। কি বিরাট স্টীমার। দেশের বাইরে তো কোনদিন যাইনি। এ যেন একটা ছোটখাট শহর। তার মধ্যে সব কিছুই আছে। কত সুবিধা, কত আরাম। তাতে উঠেই মনে হোল আহা রে। আমার দেশে জানি কবে এরকম হবে। আমি কি তখন বেঁচে থাকব?

যাচ্ছি হুক অভ হল্যাণ্ডে। সেখান থেকে ট্রেনে করে যাব কোপেনহেগেন। ডেনমার্কের রাজধানী।

ষ্টীমারে বসে জগৎ থেকে মানে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে যেতে মনটাও সরে গেল জাগতিক ভাবধারা থেকে। মনে হোল ফিরে গেছি সেই বয়সে যখন সব কিছু ভুলে হ্যান্স অ্যানডারসনের জগতে চলে যেতাম। নাওয়া খাওয়া সব ভুলে যেতাম। ভুলে যেতাম আমার চারদিকের অস্তিত্ব। কখনও মনে হোত আমি ছোট্ট ইভা, কখনও বা ফ্লাইং ট্রাংকের রাজকুমারী, কখনও বা টিন সোলজার। এই রকম আরও কত কি। তখন কি জানতাম যে জীবন অত সহজ সরল নয়।

সেই হ্যান্সের দেশে চলেছি। ছোট্ট হ্যান্স নিজের দুঃখ ভুলবার জন্য নিজের তৈরি জগতের মধ্যে থাকতে চেষ্টা করত। বড় গরীব ছিল সে। বাবা ছিলেন মুচি, ঠাকুর্দা আধা পাগল। মা মাতাল। অন্য বাচ্চারা হ্যান্সকে ছোট করে দেখত আর টিটকারী দিত। তাই হ্যান্স নিজের স্বপ্নের জগৎ তৈরি করে তার মধ্যে থাকতে চেষ্টা করত ও সান্ত্বনা পেত। বড় হয়ে সেই সব গল্পগুলিই উনি লেখেন। শেষে পৃথিবী বিখ্যাত ছোটদের গল্পের লেখক হন।

সেই হ্যান্স অ্যানডারসনের দেশে চলেছি। ছোট হ্যান্স কি তখন জানত যে তার এই স্বপ্নের জগতে পৃথিবীর সব বাচ্চা ভিড় করবে যুগ যুগ ধরে ?

হুক অব হল্যাণ্ডে পৌঁছে ট্রেনে উঠলাম।

সুন্দর ট্রেন। সবটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। রাতে ঘুমিয়ে যাওয়ার জন্য স্লিপিং কোচ নেওয়া হয়েছিল। হোলে হবে কি ? করিডর ট্রেন। বেশীর ভাগ যাত্রীই ছুটিতে দেশে যাচ্ছে। আনন্দের চোটে হৈহৈ করছে। তা আরও বেড়েছে পানীয়, মানে সুরা পেটে পড়াতে। অনেকেই গান করছে। আর এটা বুঝলাম ওখানকার লোকেরা বোধহয় মদটা একটু বেশী খায়।

ভদ্র খুব। অসুবিধা কিছু করছে না। রাত্রি বারটা অবধি আর দু চোখ এক করতে দিল না। তখনই মন স্থির করে নিয়েছিলাম— আর বাবা স্লিপিং কোচ নয়। চেয়ারকারই ভাল। মিছামিছি গুচ্ছের পয়সা নষ্ট।

সাত সকালে ত পৌঁছালাম গন্তব্য স্থানে।

দূর থেকে থাকার কোন বন্দোবস্ত না করে আসা হয়েছে। দূর থেকে করলে বেশীই দিতে হয়।

টুরিস্ট অফিস স্টেশনের গা ঘেঁষে। সেখানে যাওয়া হোল। ভদ্র-লোক অনেক জায়গাতে ফোন করে করে আমাদের প্রয়োজন ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবস্থা করে দিলেন।

বেড ও কনটিনেনটাল ব্রেকফাস্ট, মানে বড় এক কাপ চমৎকার কফি, সঙ্গে ক্রীম বা দুধ আর নানা ধরনের রুটি।

টুরিস্ট সিজন। সব জায়গা ভরা। তাই একদম শহরের মধ্যে পাওয়া গেল না। ট্রেনে করে পনের মিনিট গিয়ে দু মিনিট হাঁটলেই বাড়ি।

বাসে যাওয়া যায়। ট্যাকসিতেও যাওয়া যায়। হিসেব করে দেখা গেল ট্রেনেই সব চাইতে সস্তা। তাছাড়া পনের মিনিট অন্তর অন্তর এক একটা ছাড়ছে। সবই ইলেকট্রিকে চলে।

আমরা ভদ্রমহিলার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। স্বামী নেই। একটা মাত্র মেয়ে নিয়ে থাকে। সারাদিন মেয়ে বাইরে থাকে। কাজ করে। মা বাড়িতে থেকে বাড়ির কাজ করে। একটা ঘরে পেয়িং গেস্ট রাখে। পুরো বাড়িটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। একটা শোবার ঘর ও একটা বাথরুম আমরা নিলাম। তিনটি খাট তিনদিকে। একদিকে সোফা ও বসবার চেয়ারও রয়েছে। ঢুকে ভাল লাগল।

ওদের বসবার ঘরে টি-ভি রয়েছে। আমাদের অবশ্য বলেছিল টি-ভি দেখতে। একে আমাদের সময় ছিল না। তাছাড়া ওখানকার ভাষায় হয়। ছাই-ভস্ম কিছু ত বুঝব না।

ভদ্রমহিলা একটুও ইংরেজী বোঝে না। তবে কোন অসুবিধা হয়নি। সন্ধ্যাবেলা মেয়ে ফিরে আসত। ও বোঝে। ভাঙা ভাঙা বলতেও পারে।

আজকাল স্কানডিনেভিয়ান দেশগুলোতে আমেরিকানদের কল্যাণে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। আগে ফ্রেঞ্চ

ছিল। তাই আজকাল একটু একটু অনেকেই বুঝতে পারে ও অতি ভাঙা ভাঙা বলতে। নিজেদের মধ্যে ত বলে না। তাই স্কুল ছাড়লেই ভুলতে আরম্ভ করে।

ডেনমার্কের কথা মনে করলেই মনে আসে ওখানকার বিখ্যাত চিজ, মাখন, মাংস ইত্যাদির কথা এবং তার সঙ্গে ভাবনাটা যে ডেনমার্ক ডেয়ারী ফার্মের দেশ।

তা কিন্তু মোটেই নয়।

পৃথিবীর মার্চেন্ট জাহাজের অর্ধেক ডিজেল ইনজিন এরা তৈরী করে। প্রথম জুতো তৈরীর মেশিন আবিষ্কার করে এরাই। ললিত-কলার জন্য এরা পৃথিবী-বিখ্যাত। তাছাড়া মাছের ব্যবসাও এদের বিরাট। এখানকার লোকেরা যেরকম খাটতে পারে তেমনি আনন্দ করতে পারে। তাই বিদেশীরা এসে এখানে সত্যিকারের আনন্দ পায়।

এত পরিষ্কার শহর খুব কম চোখে পড়ে। তার বোধ হয় সব চাইতে বড় কারণ এখানে কয়লায় চালানো কোন কারখানা নেই। শহর সমতল কিন্তু তিনদিকে ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে ও একদিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা।

আমরা প্রথমেই গেলাম টাউন হলে। ওখানে বিশপ এবসালনের বড় মূর্তি আছে। উনিই এই শহরটা বানিয়েছিলেন। একটা ঘরে হ্যানস ক্রিশ্চিয়ান অ্যানডারসনের মার্বলের বাস্ট আছে। তাছাড়া নামকরা স্থপতি বাবটেল থরভল্ডসনেরও বাস্ট আছে।

টিভোলি পার্ক সত্যই দেখবার মত। বাইরে থেকে এসে প্রথম সকলেই সেখানে যায়। এই পার্কের পত্তন হয়েছিল ১৮৪৩ সালে। তখনকার নামকরা স্থপতি জর্জ প্যারসটেনসান অষ্টম ক্রিস্টিয়ানকে বলেছিলেন লোকে যদি আনন্দ করতে পারে তবে পলিটিকস্ নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

এখানে চোখে পড়বার মত একটা ব্যাপার, ছোট ছোট ছেলেরা গার্ডের মত পোশাক-আসাক পরে ব্যাণ্ড বাজিয়ে পার্কের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই পার্কের মধ্যে কি নেই? বিরাট স্টেজ, নৌকা বিহারের

ব্যবস্থা, আরও কত হরেক রকমের আনন্দ করবার ব্যবস্থা, নানা ধরনের খাবার জায়গা ত আছেই।

কোপেনহেগেনের বিকিকিনির সব চাইতে বড় রাস্তার নাম স্ট্রগেট আর তারি জুড়ি রাস্তার নাম ফ্রেডরিক্সবার্গ গাডে।

- এই দুই রাস্তার চৌমাথায় একটা সুন্দর ফোয়ারা আছে। রাজার জন্মদিনে সোনার আপেল ঝরণার জলে নেচে বেড়ায়। বাচ্চাদের মেলা বসে সেদিন এখানে, এটা দেখার জন্য।

এইখানে একটা বিরাট রাস্তা যার দুধারে সব চাইতে বড় বড় দোকান আছে ; সেটা গরম করে রেখেছে। এই পায়ে চলার পথটাতে কোনরকম যানবাহন যেতে পারে না। খোলা রাস্তা গরম। এত ভাল লাগছিল হাঁটতে। এরা কতভাবে যে প্রকৃতিকে বশে আনার চেষ্টা করছে। আর আমরা যেন অসহায় শিশুর মত প্রকৃতির দাপটে শুধু ওলটপালট খাচ্ছি।

নূতন শহরের প্রায় মাঝামাঝিতে রাজা পঞ্চম ক্রিস্টিয়ানের সুন্দর একটা মূর্তি আছে। ঘোড়ার উপর বসে আছেন। প্রতি বৎসর জুন মাসের শেষের দিকে সেই বৎসর যেসব ছাত্রছাত্রীরা ম্যাট্রিক পাস করে তারা ঘোড়া-টানা ওয়াগনে করে ওখানে আসে ও ঐ মূর্তির চারদিকে নেচে নেচে আনন্দ করে। এই সব নানা রীতি থেকেই বেশ বোঝা যায় ওরা কত আনন্দ করতে ভালবাসে। জীবনকে উপভোগ করতে ভালবাসে। ভালবাসে পৃথিবীকে রঙীন চোখে দেখতে।

আমরা যেন ঠিক উল্টো। সব কিছু থেকে দুঃখের দিকটাই চোখে পড়ে। তাই আমাদের কবিরা বোধ হয় দুঃখের কবিতাই বেশী লিখেছেন। সাহিত্যিকরা হতাশার দীর্ঘ নিশ্বাসের ভেতর দিয়েই সব কিছু দেখাতে চেয়েছেন। এমন কি বাংলা সিনেমাও কষ্ট ও হতাশা-ব্যঞ্জক।

তবে এখনকার মানুষ মনে হয় অনেকটা বদলেছে। তাই তারা আনন্দ চায়। 'হেসে নাও দুর্দিন বইত নয়।'

সেই জন্যই বোধ হয় হিন্দি সিনেমার দিকে নবযুগের মানুষ এত ঝুঁকেছে।

॥ দুই ॥

হঠাৎ বৃষ্টি নামল। এখানে বৃষ্টির দাপট মন্দ নয়। তাই ছাতা সঙ্গে নিয়ে বের হওয়া হয়েছিল। ছুটতে ছুটতে গিয়ে আমরা রয়েল প্যালেস-এর বাইরে গার্ডদের ঘরে ঢুকলাম। বিদেশী দেখে ওরা খুব ভদ্রতা করল। আমার মেয়ে সুন্দর পোশাক পরা গার্ডদের ছবি তুলতে চাইল। ওরা ত তখনি রাজি। হেসে একেবারে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদের এই সহজ ভাবটা মনকে কেড়ে নেয়।

আমালিয়েনবর্গ হচ্ছে রাজার বাড়ি। রাজার অবশ্য আরও অনেক প্যালেস আছে। এখন আমরা রোজেনবর্গ প্রাসাদে গিয়ে ঢুকলাম। এটা তখন মিউজিয়াম। এখানে প্রায় প্রত্যেক ড্যানিশ রাজারাই ক্রাউন, জুয়েল আসবাবপত্র, রাজা চতুর্থ ক্রিস্টিয়ান থেকে আরম্ভ করে, ও তাদের ব্যক্তিগত নানা ধরনের জিনিস আছে। আর আছে মুক্তা-খচিত ঘোড়ার স্যাডল অর্থাৎ জিন। এই মিউজিয়ামটা অবশ্য রাজ-পরিবারের।

একদিন ভোরে উঠে ঝলমলে রোদের মধ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। ডাইরেহেভেন, হরিণদের পার্কের উদ্দেশ্যে। কয়েক ঘণ্টা মন মাতানো, চোখ ধাঁধানো, অপরূপ দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়া গেল। মনে হোল বলি, তোমাকে দেখেই বোধ হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অপরূপা কথাটা ব্যবহার করেছিলেন তাঁর কাব্যের কোন কোণে। এই পার্কে দুই হাজার হরিণ-হরিণী আছে। তারা কাজল পরা ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ তুলে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখছে। কোন ভয়ের ভাব তাদের নেই। ওরা মনে মনে জানে এটা তাদের দেশ, তাদের ঘর। বিদেশীরা এসেছ এসো। আমরা অতিথিবৎসল, তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে দেখে নাও।

এখানে ছোট ছোট জলাশয় আছে, আর আছে নানা রকম আমোদ

করবার ব্যবস্থা। ভাল ভাল খাবার জায়গা, নৌকো করে বেড়াবার ব্যবস্থা আর সমুদ্রে সাঁতার কাটবার বীচ সাগরবেলা। এই পার্কের রাস্তার উল্টো ধারেই সমুদ্র হওয়াতে আরও সুন্দর হয়েছে। এটা ৩৫০০ একর জমি নিয়ে।

যারাই ইংরেজী পড়েছে তারাই শেক্সপীয়রের হ্যামলেট পড়েছে। এই ট্র্যাজিক নাটক কার না মনকে কাঁদিয়েছে? এই জগৎ-বিখ্যাত চিরস্মরণীয় নাটক ক্রনবর্গ দুর্গকে ঘিরে লেখা। তাই এই দুর্গটা হ্যামলেট দুর্গ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল যে প্রতিটা পাথরের মধ্যে থেকে যেন সেই চিরন্তনী কথা ধ্বনিত হচ্ছে—'টু বি অর নট টু বি'।

এই ভাবধারাটা বোধ হয় বাঙালীদের মধ্যে একটু বেশী পরিমাণে আছে। চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকা। বিচার করা মনে মনে—কোনটা ঠিক, কোন্‌টা না। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে না আসা।

তবে ত বসে বসে চিন্তা করার সুযোগটা চলে যাবে। আমাদের বড় বড় বিষয় চিন্তা করবার ক্ষমতা অসীম। ঠিক সেই ভাবেই সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতার সম্পূর্ণ অভাব।

তাই কোন বিষয়ে আমরা জোর কদমে এগুতে পারি না। সেই সাহস আমাদের জন্য নয়। ভুল হোক বা ঠিক হোক আমরা করব। করার আনন্দ আমাদের জন্য নয়। শুধু চিন্তার জালে জড়িয়ে থাকার সুখ।

তাই আমাদের পণ্ডিতেরা দিনের পর দিন চিন্তা করে গেছেন, তাল ধপ করিয়া পড়ে, না পড়িয়া ধপ করে। এই কথাটাতে আসতে পারেনি যে এটা গৌণ। তালটা যে পড়েছে সেইটাই আসল।

এই ভেবে চিন্তা করতে থাকলে 'নেপোয় মারে দই'-এর মত আর কেউ এসে ফলটা নিয়ে যাবে।

আলেকজাণ্ডার বিশ্ববিজয়ী হয়েছিলেন—কেননা মুখ্যত তিনি করার আনন্দে মেতেছিলেন। চিন্তা করতে বসলে বোধহয় বিশেষ কিছু হোত না। এটা ঠিক ভুল নিশ্চয়ই উনি অনেক করেছেন, কিন্তু এটাও ঠিক যে

ঠিকও অনেক করেছেন। তাই শাস্ত্র বলে কর্মই ধর্ম। চিন্তাই ধর্ম বলে না। যারা নিজেদের সাহায্য করে ঈশ্বর তাদের সহায়। গড্‌স হেলপ দেম হু হেল্‌প দেমসেল্‌ভ্‌স।'

যারাই ডেনমার্কে আসে তারাই জিল্যাণ্ডকে না দেখে যেতে পারে না। এই করে জিল্যাণ্ডের সব চাইতে পুরোনো শহর এলসিনোর চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

এই শহরটাকে প্রথম লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেন এরিক। চোদ্দশ তিরিশ সালে যে সমস্ত জাহাজ বালটিক সাগরে ঢুকবে ও বের হবে তাদের উপর সাউণ্ড ট্যাকস বসান হয়।

সেই সময় সমুদ্রের ধারে এই ক্রনবর্গ দুর্গ তৈরী হয় সব জাহাজের উপর কড়া নজর রাখবার জন্য। এই করে এখানকার রাজাদের বা দেশের আয় যথেষ্ট বেড়ে যায়।

এই দুর্গ বানিয়েছিলেন রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক পনের'শ চুয়াত্তর থেকে পনের'শ পঁচাশির মধ্যে।

বিরাট দুর্গ সমুদ্রের ধারে।

এখন একটা মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। কমারশিয়েল ও জাহাজ সংক্রান্ত বিষয়ই সব আছে। এখানে কারাগারের মধ্যে হোলগার দি ডেন বলে একজনের বসা মূর্তি আছে। কিংবদন্তী আছে যে ডেনমার্কের বিপদের সময় উনি জেগে উঠবেন ও তলোয়ার হাতে এই দেশকে রক্ষা করবেন।

এইখান থেকে আমরা সোজা চলে গিয়েছিলাম ফ্রেডরিকসবর্গ দুর্গে। এটা রাজা চতুর্থ ক্রিস্টিয়ান বানিয়েছিলেন তাঁর জন্মস্থানের উপরে। রেনেসাঁস স্টাইলে। এখন এটা জাতীয় ঐতিহাসিক মিউজিয়াম। এখানে ঐতিহাসিক চিত্র, ছবি, আসবাবপত্র সব রাখা আছে। আগে এই দুর্গ রাজাদের গ্রীষ্মনিবাস ছিল। ষোলশ চল্লিশ থেকে আঠার'শ চল্লিশ পর্যন্ত ডেনমার্কের রাজাদের রাজাভিষেক এখানে হোত। আজকাল অবশ্য সেই ব্যাপার উঠে গেছে। এখন ত মুকুটহীন রাজা সব। এর বাগান ফরাসী স্টাইলে তৈরী। আজকালও রাজা-

রানীরা মাঝে মাঝে এসে থাকেন। আগে এখানে পৃথিবীর সব বড় বড় রাজা-রানীরা এসে থাকতেন।

এখানকার রাজা নবম ক্রিস্টিয়ানকে ইউরোপের রাজন্যবর্গের শ্বশুর বলা হোত। ব্রিটেনের রানী, রাশিয়ার রানী ও গ্রীসের রাজা জর্জ সকলেই এর সন্তান।

অডশেরেড জিল্যাণ্ডের একটা অতি সুন্দর জায়গা। সেখানকার ফারভেল্স চার্চে গিয়ে আর্ল অব বথওয়েলের কবর দেখে কত কথাই মনে হোল। মনে হোল এত নামী ও দামী লোক হয়েও গ্রহের হাত থেকে মানে কপালের লিখন থেকে রেহাই পেল না। কত দুঃখের মৃত্যু তাকে বরণ করতে হয়েছিল।

তার সঙ্গে জড়িত রানী মেরী অব স্কটল্যাণ্ডের কথা মনে হলে চোখের দু ফোঁটা জল গড়িয়ে না পড়ে পারে না। শত হৃদয়হীন লোকেরও মনে আঘাত লাগবে। ভগবান যাকে অত রূপ দিয়েছিলেন তাকে কেন এতটুকু ভাগ্য দেন নি। শুধু দুর্ভাগ্যের বোঝা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বিচার তিনি জানেন, তিনি বুঝবেন। আমরা শুধু দুঃখই পেতে পারি।

হোটেলে ফিরে রাতে শুয়ে শুয়ে কত কথাই মনে হচ্ছিল। মানুষ বালুচরে ঘর বাঁধে, স্বপ্ন দেখে। তার মধ্যেই চোখ বুজে থাকতে চায়, ও থাকে। হঠাৎ অজান্তে ঈশান কোন থেকে ঝড় উঠে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অজান্তে হয় কি ?

না, তা হয় না।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই এর সত্যতা দেখা যায়। কি হবার ছিল, কি হোল। ইতিহাস কেন, বর্তমানেও চারিদিকে তাই হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। মানুষ কিন্তু বুঝল না। বোধহয় কোন দিনও বুঝবে না। দু-চারজন অতিমানব ছাড়া।

ঐতিহাসিক জায়গাগুলো থেকে এসে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে নানা চিন্তায়। সাধারণের থেকে অসাধারণত্বে যাওয়ার প্রয়াস। ক্ষণকালের

জন্য। তারপরই আবার সাধারণ চিন্তার দিকে ফিরে যায়। আমরা যে অতি সাধারণ। আমরা ক্ষণিক আনন্দের মধ্যে মেতে উঠতে চাই। তাই নিয়েই আমাদের জীবন, তাই নিয়েই আমাদের মরণ।

আমরা হ্যান্স অ্যানডারসনের জন্মভূমি ওডেন্সে এলাম। এখানকার মিউজিয়ামে তার লিখবার ডেস্ক, মাথার টুপি, পোরটমেন্ট এবং জগৎ বিখ্যাত ছাতা সযত্নে রাখা আছে এবং একটা দড়িও রাখা আছে। উনি সব সময়ে এই দড়িটা সঙ্গে রাখতেন। হঠাৎ আগুন লাগলে যেন এই দড়ির সাহায্যে নামতে পারেন। আগুনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনদিন উনি পড়েননি। না হলে দড়িটা অক্ষতভাবে থাকতে পারত না।

ওখানে পেন্টিং-এর মাধ্যমে তাঁর জীবনের ঘটনা জীবন্ত করে রাখা আছে। চার্লস ডিকেন্স ও জেনী লিণ্ডের সঙ্গে তাঁর লেখা চিঠি ও উত্তরগুলোও রয়েছে।

ইউরোপের সঙ্গে ডেনমার্ককে যুক্ত করেছে জোটল্যাণ্ড পেনিনসুলা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে যথেষ্ট। বালিয়াড়িতে ভরা বেলাভূমি ফিওর্ড, পাহাড়, হ্রদ—এইসব মিলিয়ে দেখবার মত জায়গা।

এখানকার রিবে গ্রামটি বলতে গেলে এখনও অতীতেই রয়ে গেছে। সেই পুরোনোকালের সরু সরু ঘোরানো রাস্তা পুরোনো সব বাড়ি আর সারস পাখির বাসা।

সেখানকার আটশ বছরের পুরোনো ক্যাথিড্রেল। এখানে দক্ষিণে একটা দরজা আছে, ক্যাটস ডোর। কিংবদন্তী আছে, শয়তানকে শুধু রাতে এই দরজা দিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়।

এখানে সকলেই খুব অতিথিবৎসল। ডেনমার্কের লোকেরা যে নিজেরা শুধু আনন্দ করতে চায় তা নয়; বিদেশীরাও যাতে এখানে আসতে ও থাকতে উৎসাহ পায় তার জন্য যথেষ্ট চিন্তা করেছে।

ওরা বুঝেছে যে বাইরে থেকে লোক আসলে দেশ সমৃদ্ধ হয়। তাই জোটল্যাণ্ডের পশ্চিমের পুরো সমুদ্রকূল এমনভাবে তৈরী করে রেখেছে যে লোকে গিয়ে থাকতে ও আনন্দ করতে পারে। সমুদ্রের পাড় দিয়ে মাইলের পর মাইল মোটরে ড্রাইভ করে যাওয়া যায়।

এগিয়ে গেলেই পুরোনো নগর 'আরহাসে'-এর ওপেন এয়ার মুক্তাঙ্গনে মিউজিয়াম। এ রকমটা আর কোথাও দেখা যায় না। এর মধ্যে আটচল্লিশটা বাড়ি আছে। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সময়কার জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো। ডেনমার্কের নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এনেছে।

• এখানকার রাস্তা-ঘাট, দোকানপাট, এমনভাবে তৈরী আর সাজানো যে মনে হয় সেই বিশেষ যুগেই এই জায়গাটা থমকে থেমে রয়েছে। চারিদিক বদলে গেছে ও যাচ্ছে। এই জায়গার যেন তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। এ যেন এক কিসের ধ্যানের মধ্যে রয়েছে। পারিপার্শ্বিক কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না।

এইভাবে যদি আমাদের দেশে কখনও পুরোনো নগর তৈরী করে কেমন ভাল হয়। এক একটা যুগকে নিয়ে এক একটা ছোট্ট নগর। লোকেরা যাবে, দেখবে, শিখবে, ভাববে। আমরা অনেক সময় মনে মনে অন্য যুগে চলে যাই। নিজেরাই যেন তখনকার একটা চরিত্র সেইভাবে বিভোর হয়ে যাই। সকলেরই বাস্তব থেকে অবাস্তবে মাঝে মধ্যে যেতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে এই রকম দ্রুতগতি থেকে সরে আসতে। এত সমস্যাবহুল পরিস্থিতি থেকে দূরে বহু দূরে চলে যেতে। তাই কবি বলেছেন—

'আমি যদি জন্ম নিতাম
কালিদাসের কালে!

॥ তিন ॥

ডেনমার্ককে থ্রি চিয়ার্স করে আমি সে ও মেয়ে রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছোলাম।

আসার সময় স্লিপিং কোচে বেশী টাকা দিয়ে টিকিট কিনেও ভাল ঘুমাতে পারি নি বলে এবার চেয়ার কারেই টিকিট কাটা হয়েছিল। পয়সাও বাঁচবে আর না ঘুমাতে পারলেও কষ্ট হবে না। জেনে বুঝেই ত এইভাবে চলেছি। যাইহোক একটু আগে-ভাগেই এসে পড়া গিয়েছিল।

ওনার ত বরাবরই সেই অভ্যেস। তাছাড়া আমার ছোটবেলা থেকেই এই অভ্যেস। বাবা আবার আরও এক কাঠি বেশী ছিলেন। সাত-তাড়াতাড়ি আমাদের সবাইকে স্টেশনে নিয়ে হাজির করতেন। মা তাই কোথাও যাবার কথা শুনলেই বলতেন, তোমাকে আর বলতে হবে না কখন ট্রেন ছাড়বে। আমাদের গিয়ে প্ল্যাটফর্ম ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে, তাছাড়া আরও যদি কিছু করবার থাকে করে সারলে তবে ত ট্রেন আসবে।' যদিও যাওয়া হত ফার্স্ট ক্লাসে এবং পুরো কমপার্টমেন্টই রিজার্ভ থাকত।

বাবা বলতেন, 'আহা চট কেন। কত রকম অঘটন ঘটতে পারে। এই ধর, মোটরের চাকা পানচার হোল, একসিডেন্ট হোল, (তখনকার দিনে আবার হাওড়া ব্রিজ অনেক সময় কিছুক্ষণের জন্য খুলে দেওয়া হোত বড় বড় জাহাজ যাবার জন্য।) হাওড়া ব্রীজ খুলে নিল আরো সাত-পাঁচ কত কিছু অঘটন ঘটতে পারে। সে সব সত্ত্বেও যাতে পৌঁছে ট্রেন ধরা যায় সেই জন্যই ত এত আগে ভাগে যাওয়া।'

'হ্যাঁ হোতে ত সবই পারে তবে একটাও অঘটন এখন পর্যন্ত ঘটেনি। কিন্তু তোমার ব্যাপার দেখলে মনে হয় সব কটিই আমরা যেদিন কোথাও যাব সেদিনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। মনে হয় যেন আমাদের যাবার দিনই ত্র্যহস্পর্শ মঘা ইত্যাদি পঞ্জিকার যত কিছু খারাপ দিন।

সবার উচিত পঞ্জিকা কেনার পয়সা বাঁচানো। পঞ্জিকা না কিনে আমাদের যাবার দিনগুলো খেয়াল রাখা।'

যাই হোক আমরা বেশ আগে-ভাগেই রাতের খাওয়া সেরে স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। সারা দিনের ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত বোধ করছিলাম। তাই স্টেশনের মধ্যেই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে কফি নিয়ে বসে পড়লাম। ট্রেন আসা পর্যন্ত এখানেই থিতু হয়েছি এই কথাটা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিলাম।

মেয়ের আবার সব কিছু জানবার বা দেখবার ইচ্ছেটা বেশী। আসল কথা কানে কানে বলে রাখি একটু ছটফটে। আর খুব দায়িত্ব নিয়ে চলছে এই ধারণা। বাপ-মার যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় বা না হতে পারে তার জন্য সে সব সময় সজাগ ও সচল।

ও বলল, মা আমি একটু ঘুরে দেখে আসি। যদি স্টেশনের অন্য কোন দোকানে ভাল কিছু মুখরোচক খাবার জিনিস থাকে তবে কিনে নেব। তাছাড়া ফল ইত্যাদি। তাড়াতাড়ি ত খাওয়া হয়েছে। তোমাদের খিদে পাবে।

ওর পাকামো দেখে ভালই লাগছিল। বললাম যা ঘোর গিয়ে। আমরা এখানেই থাকব।

কিছুক্ষণ পরে এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। আমরা যে ট্রেনে যাব সেই ট্রেনে এখানকার এই রেলওয়ের অফিসারটা যাবে অল্পক্ষণের জন্য। পাসপোর্ট, টিকিট ইত্যাদি সবই এক সঙ্গে চেক করে নেবে। তারপর আর একজন উঠে স্টকহোম অবধি যাবে। এই ভদ্রলোক মাঝারী বয়সী। ভাল ইংরেজী জানে।

আগেই বলেছি এসব দেশের বেশীর ভাগ লোকই ইংরেজী জানে। গত মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষে এসেছিল এলাইড আর্মির সঙ্গে। পাঞ্জাব দিল্লী এইসব দিকটাতে ছিল। মেয়ে বোধহয় ওর কাছে কিছু জানতে চেয়ে থাকবে, সেই করেই আলাপ। ভারতবাসী জেনে ও খুব উৎসাহিত বোধ করে। তাই আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে। মেয়ের কাছ থেকে সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিল।

সে এসেই বলল, তোমাদের ত আসার সময় কষ্ট হয়েছে। ঘুমাতে পার নি।

আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। 'তা সামান্য হয়েছে, কিন্তু তোমাদের দেশ দেখে দেশবাসীর সঙ্গে আলাপ হয়ে সব ভুলে গেছি। অপূর্ব দেশ। তাছাড়া লোকেরাও কেমন সহজ। আমাদের খুব ভাল লেগেছে।'

'তবে আরও কিছুদিন থাকলে না কেন?'

'পারলে নিশ্চয়ই থাকতাম। কিন্তু আরও অনেক কিছু দেখবার বাকি আছে, তাই মন না চাইলেও যেতে হচ্ছে।'

'তোমাদের দেশও আমার খুব ভাল লেগেছিল। এখন ত আরও কত ভাল হয়েছে।'

বললাম, 'সত্যিই তাই। তুমি এলে খুব খুশী হতে। আমরাও খুব খুশী হতাম।'

একবার ও বলল, 'তোমরা ত তোমাদের দেশে খুবই মান্যগণ্য লোক ও চলাফেরাও কর কত ভালভাবে। এখানে ফরেন এক্সচেঞ্জের জন্যই ভেবে চলতে হচ্ছে।'

'তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু নূতন দেশ দেখবার আনন্দ—শুধু তাই কেন, এই দেশ দেখবার ও অনেক কিছু শিখবার যোগ্য বলেই এত আনন্দ পাচ্ছি।'

এই রকম অনেক কথাবার্তা হোল। দেখলাম ভারতবর্ষের বিষয় বেশ ভাল ধারণা ও অনেক খবরও রাখে।

ট্রেন এসে পড়ল। আমরা উঠে আরাম করে ঠিক হয়ে বসলাম। পরের স্টেশনটা ছেড়ে যাবার পরই সেই ভদ্রলোক এসে আমাদের জিনিস নিয়ে ওর সঙ্গে যেতে বলল। আমরা একটু আশ্চর্য হলাম।

ও হেসে বলল, 'আর একটা কমপার্টমেণ্টে চলো, ভাল লাগবে।'

যাই হোক উঠে ওর সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম একটা রেগুলার স্লিপিং ফার্স্ট ক্লাসে।

বলল, 'এই কমপার্টমেণ্টে তোমরা থাক, কোন অসুবিধা হবে না, আরাম করে ঘুমাতে পারবে।'

বললাম, 'আমাদের ত চেয়ার কারের টিকিট।'

হাসল, কতদূর থেকে আমাদের দেশ দেখতে এসেছ—কত কষ্ট করে। এইটুকু আমরা করব না? আমি সব ব্যবস্থা করে নিয়েছি। এই স্টেশনে আমি নেবে যাচ্ছি। আর একজন এখন এই ট্রেনের চার্জ নিচ্ছে। সে দেখবে তোমাদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। আবার কোন না কোন দিন দেখা হবে। ফর দি প্রেজেণ্ট অ-রিভোয়া, এখনকার মত বিদায়। আবার দেখা হবে বলে নেবে গেল।

মনে হোল কোথায় কোন্ পরশমণি ছড়িয়ে আছে—কে তার সন্ধান দেবে?

১৩৫০ এ প্লেগের মহামারীতে নরওয়ের তিন ভাগের এক ভাগ লোক মারা যায়। সেই সঙ্গে রাজ-পরিবারের সবাই শেষ হয়ে যায়। এইভাবে এই দেশ আবার ডেনমার্কের সঙ্গে জড়িত হয় ও সেই দেশেরই অংশ হয়ে পড়ে। পরে শেষে সেই দেশের রাজকুমারকে নিয়েই ওরা আবার স্বাধীন হয়ে দাঁড়ায়।

১৯০৫-এ নরওয়ে ডেনমার্কের-এর কাছ থেকে বন্ধুত্বের ভিতর দিয়ে সরে গেল। ডেনমার্কের লোকেরা আপত্তি করতে পারল না, কেননা নরওয়ে তাদেরই একটি রাজকুমারকে তাদের দেশের রাজা করল, সপ্তম হেকন।

গত মহাযুদ্ধে এলাইড আর্মীকে সাহায্য করেছিল বলে পাঁচ বছর জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

জার্মানরা দেশটাকে নিয়েও রাখতে পারে নি। ৬০০,০০০ নাজি সৈন্যও ওদের সঙ্গে পেরে ওঠে নি। তাতেই বুঝতে পারছেন এরা কি ধাতুর তৈরী।

এরা হচ্ছে দুর্ধর্ষ জলদস্যু ভাইকিংদের বংশধর যারা এককালে সারা ইউরোপকে কাঁপিয়ে রেখেছিল।

এই চারটি দেশে যে সুসভ্যতার আলোক সব চাইতে আগে এসে পৌঁছেছে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

মেয়েদের ভোট দেবার অধিকার পৃথিবীতে এইখানেই প্রথম স্বীকৃত হয়েছিল। আরও অনেক শুভ কাজে এই দেশগুলি সবার আগে এগিয়ে গেছে।

এখানে সরকার ও লোকদের মধ্যে একটা বড় মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সরকার একদিকে যেমন দেশের লোকের প্রতি দায়িত্বের কথা মনে রাখে তেমনি দেশবাসীরা দেশের প্রতি ও সরকারের প্রতি দায় দায়িত্বের কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যায় না।

শুধু যার যার নিজের চিন্তা তারা করে না। তারা এটা খুব ভালভাবে বোঝে যে নৌকো সবাই মিলে বাইলে যেভাবে চলে একলা হলে তা হয় না।

নরওয়ের রাজধানী অসলোতে পৌঁছে মনে হোল কলকাতারই বড় বোন, যদিও অনেক বেশী অবস্থাপন্ন ঘরে তার বিয়ে হয়েছে, অনেক বেশী রূপসী বলে।

টুরিস্ট অফিস আমাদের মাঝারী মত হোটেলে ব্যবস্থা করে দিয়ে বলল—সঙ্গে জিনিস আছে তাই বলছি বাসে করে যেতে, না হলে বলতাম রাজপ্রাসাদের পার্কের ভেতর দিয়ে চলে যাও। মানে হোটেলের প্রায় উল্টো দিকেই রাজপ্রাসাদ।

বুঝুন ঠেলা, কোথায় মাঝারী ধরনের হোটেল, তার কাছে রাজ-প্রাসাদ। এটা একেবারেই প্ল্যান করা শহর নয়। ছোট বড় মাঝারী সবই পাশাপাশি রয়েছে। বলা যেতে পারে ইউরোপের কলকাতা। এই জন্যই বললাম যে কেউ যেন এটা না মনে করেন বস্তির পাশেই পাকা সুন্দর হাল-ফ্যাসানের বাড়ি, বা ছিমছাম বাড়ি ঘিরে রয়েছে নোংরা ভাঙা বস্তি।

বস্তি জিনিসটা এই চারটি দেশের মানে স্ক্যানডিনেভিয়ার কোথাও পাবেন না।

যাক যা বলছিলাম। এখানে যে রকম স্থাপত্যবিদ্যার উৎকর্ষ রয়েছে—আবার তার পাশেই বোধ হয় অন্য ধরনের বাড়িও রয়েছে। এই মেলানো মেশানোর একটা সৌন্দর্য রয়েছে। অন্য সব দেশগুলো

থেকে আলাদা। ছকে আঁটা নয় যে এক ডিজাইনের বাড়ি এক রাস্তায় থাকতে হবে। তাও ভাল লাগে ঠিকই। আবার এই দেশের এই ধারাটিও বেশ লাগে।

এই অসলো শহরটি যে শুধু পৃথিবীর সব চাইতে বড় শহরদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে তা নয়, এই শহরটার বেশীর ভাগই বড় বড় গাছে ঢাকা। এর একটা সব চাইতে বড় কারণ এরা কোন কিছু করবার জন্য কোথাও গাছ কেটে ফেলে না। বড় বড় গাছ রেখেই যা করতে চেয়েছে তা অন্যভাবে করেছে।

তাই পৃথিবীর সব চাইতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময়ী নগরী হচ্ছে এইটি।

অসলোতে বলতে গেলে সারা বৎসরই ভিড় লেগে থাকে। ইয়োরোপের অন্যান্য রাজধানীগুলিতে সিজন বলে একটা কথার চারিদিকে সেই দেশের অনেক কিছু ঘুরছে। আমোদ-প্রমোদ, আয়-ব্যয় দেশের বেশ বড় রকম একটা দিক।

পৃথিবীর মধ্যে উইনটার স্পোর্টস-এ সবচাইতে নামকরা শহর হচ্ছে অসলো। জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই স্কী বা স্কেটিং অথবা টবাগনিং করে। সেই সময় বাইরে থেকেও লোকেরা এখানে এই খেলার জন্য আসে। ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ-এর মধ্যে সারা পৃথিবীর স্কী করনেওয়ালারা হোমেনকলেনে জড়ো হয় আর কমপেটিসন আরম্ভ হয়।

সে এক দেখবার জিনিস। দশ লক্ষাধিক দর্শক জড়ো হয়। নানা দেশের নানা পোশাকে।

আমরা অবশ্য এই সময়ে যাইনি। হোমেনকলেনে গিয়ে ও লোকেদের কাছে শুনে মনশ্চক্ষুতে তা উপভোগ করলাম। কাশ্মীরে গিয়ে মনে হয়েছিল এখানে উনটার স্পোর্টিং-এর ভাল ব্যবস্থা থাকলে বেশ হোত।

তবে এটা ঠিক আমাদের দেশে খেলাধুলোর উৎসাহ কম। বসে বসে দেখার দিকে কিন্তু এই রকম উৎসাহ পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ।

আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেও এই পশ্চিমবঙ্গে বসে দেখার উৎসাহ যত বেশী আর কোন স্টেটে তত নয়। পাগলের মত খেলার মাঠের দিকে লোকেদের এভাবে যেতে দেখিনি। কোথাও এই কলকাতার মত হয় না। তার কারণ অন্যান্য দেশ খেলোয়াড় দেয় আর আমরা দিই দর্শক।

আমরা তিনজন ফ্রগনার পার্কে এসে অবাক হয়ে গেলাম। মনে হোল এ যেন আর এক নরওয়ে। লোকেরা যেন সব রূপকথার রাজত্বের দৈত্যের কাঠির পরশে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বুঝছে, জানছে, দেখছে—সবই; শুধু সবাক ও সচল হতে পারছে না। এই দিকটা সোনার কাঠির স্পর্শের জন্য অপেক্ষা করছে।

এখানকার অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও গ্রানাইটের মূর্তিগুলি তৈরি করেছেন এই দেশেরই প্রতিভাধর স্থপতি গুসটাভ ভিগল্যাণ্ড। অগুন্তি মূর্তি নানা ভাবে নানা ধাঁচে। অদ্ভুত। মনে হয় মানুষের কোন রকম চেহারাই যেন তাঁর চোখ এড়ায়নি। নানা ধরনের ভাবধারা যা মানুষের মনে উদয় হয়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, তা সব উনি নিজের মনের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন। নানা ধরনের মনের রকম রকম ভাবধারা কোন কিছুই যেন তাঁর বুঝতে বাকি নেই। মূর্তিগুলির মুখের ভাব দেখলে এই সব কথা মনে হয়।

নানা মুনির নানা মত। কারও চোখে অপূর্ব, আবার কারও চোখে কিছু কিছু মূর্তির দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ে।

তবে ছোট বাচ্চাদের যে মূর্তিগুলো একটা আলাদা বাগানে ব্রীজের পাশে আছে সেগুলির বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হয় প্রতিটী মূর্তি যেন বলতে চাইছে কবির ভাষায়—

> যুগ যুগান্তের মহা-মৃত্তিকাবন্ধন
> সহসা কি ছিঁড়ে যাবে। করিব গমন
> ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি
> চারিদিক হতে মোরে লবে নাকি টানি।

এখানকার দেখবার মত আরও কত কিছু। বিরাট লোহার প্রবেশদ্বার ব্রীজের দেওয়ালের ওপর সুন্দর মূর্তিগুলি ঝরণার চারিধারের বাস বিলাক বোঝাতে চেষ্টা করছে—চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। তবে শিল্পীর মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্প হচ্ছে ষাট ফুটের একটা অখণ্ড পাথরে খোদাই মনোলিথ।

আজকের আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে এখানকারই একজন নামকরা নাট্যকারের কথা মনে আসছে। হেনরিক ইবসেন পৃথিবী বিখ্যাত নাট্যকার। নারীবর্ষে এঁর কথা পৃথিবীর সব মেয়েদেরই মনে আসবে। কারণ উনি বলতে গেলে প্রথম মেয়েদের নিজস্ব সত্তার বিষয় চিন্তা করেছিলেন। তাঁর নাটক ডলস হাউস পুতুল খেলার মধ্য দিয়ে। এই নাটকের নায়িকা নোরা পৃথিবীর মধ্যে বিদ্রোহিণী নারীর স্বাধীন সত্তার প্রতীক হিসাবে বিরাজ করছে ও করবে।

এখানকার জাতীয় থিয়েটার হলের চারিদিকেই জীবনের উৎস। এই হলের দুদিকে দুটি বিরাট মূর্তি। একটা হেনরিক ইবসেনের আর একটা বিয়র্ন বিয়র্নসেনের। দুজনেই স্বনামধন্য নাট্যকার ও কবি।

এখানকার আর্কেশাস দুর্গ অতীত ও বর্তমান দু যুগেরই ইতিহাস বহন করে। যখন নরওয়ে ডেনমার্কের অধীনে ছিল সেই যুগের ড্যানিশ চতুর্থ কৃস্টিয়ানের মূর্তি আছে এখানে। চোদ্দশ খৃষ্টাব্দে রাজা পঞ্চম হেকন এখানেই বাস করতেন। আবার ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মান সেনাবাহিনীর দপ্তর ছিল। এই দুর্গতে জার্মানরা যে সব দেশপ্রেমিককে ফাঁসি দিয়েছিল তাদের স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। আর রয়েছে একটা ফটো যাতে দেখা যাচ্ছে যে দুজন জার্মান অফিসার স্যালুট করছে নরওয়ের হোম ফ্রন্টের লোককে মে মাসের এগার তারিখ উনিশ পঁয়তাল্লিশে। এই দিন এই দেশ জার্মানদের হাত থেকে বন্ধনমুক্ত হয়।

দেশ-প্রতারকের ইংরেজী শব্দ হয়েছে কুইসলিং। এই কথাটার উৎপত্তি হয়েছিল এই দেশ থেকেই। এখানকার লোক এত বেশী দেশ-ভক্ত এত বেশী দেশপ্রেমিক যে দেশের যাতে অমঙ্গল হয় তা কেউ করতে পারে একথা ওরা ভাবতেও পারে না।

এদের মধ্যে একজনই দেশ-প্রতারক বেরিয়েছে এতদিনে। তার নাম ছিল মেজর কুইসলিং। তাকে যেখানে গুলি করে মারা হয় সেই জায়গাটাতে সব কথা লেখা আছে যাতে সকলে জানে ও বোঝে এর চাইতে বড় পাপ আর নেই।

এখানে এসে মনে হল এই এতটুকু একটা দেশ। কত সংগ্রামের পর কত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পদশালী, কত বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী। শিক্ষা দীক্ষায় সভ্যতায় কালচারে পৃথিবীর বড় বড় দেশের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য।

এই ত সেদিন কাগজে দেখলাম ভারত নরওয়ে ও বৃটেনের কাছ থেকে বম্বের সমুদ্রে পেট্রল ড্রিলিং-এর জন্য সেমি-সাবমারসিল টাইপ প্ল্যাটফর্ম নিচ্ছে।

বিগডইর মিউজিয়ামে কনটিকি বামসা ডিঙ্গি নৌকা রাখা আছে। এটাতে করে বর হেয়েরডাল নামে একজন নরওয়ের নৃতত্ত্ববিদ প্যাসিফিক মহাসাগরের চার হাজার আটশ মাইল, পেরু থেকে পলিনেসিয়াতে গিয়েছিল।

এর মধ্যে সাউথ প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা ও এশিয়া এই দুই মহাদেশেরই লোক প্রথম বাস করতে যায়। এখন পর্যন্ত প্রমাণ হয়েছে শুধু এশিয়া মহাদেশেরই লোকেরা প্রথম এখানে যায়।

এত করেও অবশ্য ভদ্রলোক তার থিওরী প্রমাণ করতে পারেননি। কিন্তু তার বোটটা এখনও সযত্নে রাখা আছে ও সেটা একটা দ্রষ্টব্য।

আর এক মিউজিয়ামে দেখা যাবে আটশ বা নয়শ খৃষ্টাব্দের তিনটা ভাইকিং জাহাজ। তখনকার দিনের সব চাইতে বড জাহাজ যেটা রাখা আছে সেটার নাম গাকশটাড জাহাজ। এই জাহাজে করে ভাইকিংরা আটলান্টিক মহাসমুদ্র পারাপার করত। এখন এটা দেখে কত ঠুনকো মনে হয়। এতে আরও আমরা বুঝতে পারি এদেশের লোক কত দুঃসাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল।

এখানকার পুরোন শহর বলে বিশেষ কিছু নেই। রাজা হারাল্ড দি হার্ডি যে বড় শহর বানিয়েছিলেন তা ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

সেখানে অনেক ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। এখানে মার্চেন্ট মেরিন অ্যাকাডেমিতে যাবার একটা মস্ত বড় সার্থকতা আছে। এখানকার নামকরা নরওয়েজিয়ান চিত্রশিল্পী পার ক্রুগ-এর আঁকা দেওয়াল চিত্র ম্যুরালস আছে। নিউইয়র্ক এর ইউনাইটেড নেশনস্ বিল্ডিংয়ে এঁর কাজ আছে।

তাছাড়াও গানার উসটগুের বানান স্থাপত্য আছে, তার ফলকে লেখা আছে দি জার্নি টু হেল—নরকের পথে এই নামটা বা এই রকম ভাবটা কেন তার মনে এসেছিল তা বুঝতে পারিনি।

এত সুন্দর দেশ। এত সৌন্দর্য বলেই কি তার মনে এসেছে যে জাহাজে যাওয়া মানেই ত এই দেশ থেকে দূরে যাওয়া অর্থাৎ স্বর্গ থেকে বিদায়।

তা কিছু সময়ের জন্য হলেও বিদায় ত বটে।

॥ চার ॥

এখন আমরা তিনমূর্তি চলেছি অসলো ফিয়ড ও সুইডেনের মাঝখানের জায়গাগুলোতে। চড়েছি এক নূতন রকমের স্টীমারে— হাইড্রোফয়েল স্টীমার। এটা জলের কম সে কম এক হাত উপর দিয়ে যায়। উঠে মনে হোল উড়ে যাচ্ছি, কিন্তু ঠিক উড়েও যাচ্ছি না। এতে চড়ে যাবার একটা আশ্চর্য রোমাঞ্চ আছে।

যা কখনও দেখিনি, যা কিছু করিনি, যা কিছু ভাবিনি সে সবই মানুষের মনে আনন্দের ধারা বইয়ে দেয়। তাই মনে হয়, ছোটবেলায় সব কিছু যেভাবে মন ভরিয়ে দেয় সেভাবে পরে—আর কিছু দেয় না। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমরা যে আস্তে আস্তে সবই বারে বারে দেখি। নূতনত্ব থাকে না। তাই এই অভিনব জিনিসে চড়ে ছোটবেলার মত মনটা নেচে উঠল উল্লাসে।

আর সেই মুহূর্তেই এই কথা উপলব্ধি করলাম বয়স এর জন্য দায়ী নয়, দায়ী বারে বারে দেখাটা।

এক অদ্ভুত অনুভূতি। মনে হোল এ যেন এক উল্টো রাজার দেশ। এই অবধি জানলাম ও দেখলাম জাহাজ জলের উপর দিয়ে যায় আর উড়াই জাহাজ যায় উড়ে আকাশে সমুদ্রের সাথী হয়ে।

ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ল। তখন আমি স্কুলে পড়ি। কত আর বয়স হবে, দশ এগারো। বাবা-মার সঙ্গে ট্রেনে করে আগ্রা চলেছি। তাজমহল দেখাটাই মোক্ষম উদ্দেশ্য। আগ্রা স্টেশনের একেবারে কাছে এসে ট্রেন থেকে তাজমহল দেখা গেল। দেখে ভাবতে লাগলাম এই দেখবার জন্য এত লাফালাফি। খুব সুন্দর ঠিকই, তবুও এমন কি। এই ভাবটা মনে এসেছিল কেন না তার আগে তাজমহলের অনেক ছবি দেখেছি, এমন কি হাতির দাঁতের তৈরী তাজমহলও

দেখে এসেছি। তাই একেবারে প্রথম দেখার আনন্দটা ক্ষীণ হয়ে গেছে।

প্রথমেই নামলাম 'মস' বলে একটি শহরে। এই জায়গা কাগজ ও কাগজের মণ্ডের শিল্পের জন্য বিখ্যাত। তাছাড়া আছে মদের বড় কারখানা। এখানকার সার্পসবরগ এবং ফ্রেডরিকস্টাড এই দুটো শহরই সুইডিশরা অনেকবার আগুন জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে। তাই এখানে অতীতের বিশেষ কিছুই নেই।

আবার এদের মনের দৃঢ়তাও লোক দেখান বাইরের নয়। সত্যিকারের ভগবানে বিশ্বাসের জন্য এরা উঠে দাঁড়িয়েছে। 'ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি' এই কথার পাশে পাশেই মনে আসে আমাদের দেশের এক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নেহরুর কথা, 'আরাম হারাম হায়।'

সার্পসবরগে এখন পৃথিবী বিখ্যাত বরেগাগারড কাগজের কারখানা। ফ্রেডারিকস্টাড দুর্গে গিয়ে কত স্মৃতিচারণ শুনলাম। তখনকার দিনে দেশকে সুইডেনের হাত থেকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা। হাজার হাজার মানুষের দেশের জন্য আত্মাহুতি রক্তের মধ্যে যেন শিহরণ জাগিয়েছিল। আমার ভারতবর্ষে ইংরেজদের হাত থেকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙবার জন্য মহাত্মার এক ডাকে লবণ আন্দোলনের সময় কাতারে কাতারে লোক ইংরেজদের বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই মনে হয় আমাদের মধ্যেও প্রাণ আছে। শুধু আমরা যেন ক্ষণিকের জন্যেও ভুলে না যাই অতীতের পরাধীনতার গ্লানির কথা আর বহু কষ্টে উপার্জিত স্বাধীনতার কথা ও স্বাধীনতা রক্ষার কথা।

টেলেমারকের ভালেন নামক জায়গাতে আগে টুরিস্টরা যেত এর অভিনব প্রাকৃতিক রূপ দেখবার জন্য। এখন এখানে গড়ে উঠেছে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ টোকে হাইড্রোইলেকট্রিক স্কীম এবং ৮০০,০০০ কিলোওয়াটের পাওয়ার স্টেশন হচ্ছে। এখানেই আছে একটা মিউজিয়াম যেখানে পৃথিবীর সব চাইতে পুরান কাপড়ের মেশিন আছে। প্রায় শ'দুই বৎসর আগে এই মেশিনটা বানিয়েছিল টেলেমারকের এক চাষা।

এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে এক অদ্ভুত সুন্দর জিনিস আছে। হাজার ফুট উঁচু থেকে টোকে উপত্যকার জল নামছে, আর সেখানকার হাওয়া ঠিক এমনভাবে চিরকাল বয়ে আসছে যে যা কিছু ওখানে ছুঁড়ে দেবেন তা আবার আপনার কাছে ফিরে আসবে। এমন কি কাগজের টুকরো পর্যন্ত।

একটা জিনিস এখানকার অধিবাসীরা পেয়েছে—নিকেল—ইউরোপের মধ্যে সব চাইতে বেশী। এই নিকেলের রিফাইনারী হচ্ছে টেলেমারক জেলার ক্রিস্টিয়ানসাণ্ড বলে একটা জায়গাতে।

সারা নরওয়ে এত খোলামেলা, লোকেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্বন্ধে সব জায়গাতেই সর্বত্রই এত সজাগ। কিন্তু এই ছোট জায়গাটাই এর ব্যতিক্রম। বাড়িগুলো সুন্দর, ছিমছাম, কিন্তু একেবারে গায়ে গায়ে। জমি নেই দুটো ফুলের চারা বসাবার। বেশ একটা মজার কথা বলেছিলেন গেব্রিয়েল স্কট এই জায়গার সম্বন্ধে—কেউ যদি নিজের বাড়ির জানালার ধারে অন্যমনস্কভাবে পাইপ টানে তবে ভুলে পাশের বাড়ির বসবার ঘর থেকে থুক করে দেবে।

এখানে একটা জিনিস খুবই লক্ষণীয়। যা কিছু পেয়েছে তা এতটুকুও ওরা অবহেলা ত দূরের কথা, তার সুযোগ এরা শত ভাগের এক অংশও ছাড়েনি। জলপ্রপাতে ভরা দেশ, তাই হাইড্রোইলেকট্রিক প্ল্যাণ্ট চলছে বা চালু হবে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা চলতি কথা 'চক্ষু রত্ন বড় রত্ন'। সত্যিই তাই চোখ না থাকলে মানুষের থাকা না থাকা প্রায় একই দাঁড়ায়। চোখ থাকলেই কি সকলে চক্ষুষ্মান হয়? চোখ থেকেও তা মানুষ যা দেখা দরকার তা দেখতে পায় না।

আসল চোখ যে মনের চোখ। সেইখানে যে আমরা ঠুলি পরা। তাই কাজল কালো চোখ থেকেও আমরা দেখি না! আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষে কি নেই? কত ঐশ্বর্য কতভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু দেখে কুড়িয়ে নাও।

যাঁরা দূরদ্রষ্টা যাঁরা চক্ষুষ্মান তাঁরা সকলেই দেশের সব কিছু দেখতে

পেয়েছেন ও বুঝতে পেরেছেন বলেই এইভাবে সবাইকে বলেছেন। যেদিন এই বিশাল ও মহান দেশের সবাই তাঁদের প্রতিটা কথার অর্থ বুঝতে পারবে সেদিন আমাদের দেশ কত বড় হবে।

আমাদের দেশ অবশ্য নূতন জীবনে নবীন, তাই তার ভবিষ্যৎ সীমাহীন উজ্জ্বল।

এই টেলেমারককে বলে 'সামার স্মাইল'। গ্রীষ্ম ও তাপের মিষ্টি হাসি। এই শহরটা হচ্ছে বলতে গেলে অনির্বচনীয় রূপের ডালি। এঁকে-বেঁকে যাওয়া উপত্যকা, ভয়াল খাদ, রূপালী হ্রদ, আবার আর একদিকে শ্যামলা মাঠ, রুপোর চুড়োওয়ালা পাহাড়, সব মিলিয়ে এক স্বপ্নালু দৃশ্য রচনা হয়েছে।

ঘরমুখো বাঙালী চললাম ফিরে সাময়িক ঠুনকো ঘরে, অসলোতে। ক্লান্ত পা দুটো বিছানাতে তুলে বসতে। গালে এক ঠুপলো পান ছাড়াই। বিদেশে নিয়ম নাস্তি।

এবার আমরা চললাম নরওয়ে মধ্যরাতের দিনের আলোর দেশে। স্টীমার থেকেই একটা আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়। একটা উঁচু পাহাড়ে পাঁচশ ফুট গভীর গহ্বর। সাত বোন চম্পা। এরা অবশ্য চম্পা নয়, এরা সাতটা বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া পাশাপাশি।

এদের বলে সেভেন সিসটারস। এত গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে যে মনে হয় সাতটি বোন।

আরও একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে একটা রুক্ষ পর্বত, হেস্টমানেন বা হরসম্যান। তার গড়ন এমন অদ্ভুত ঠিক মনে হয় ঘোড়ায় চড়া ঘোড়সওয়ার।

এই বিষয়ে বেশ একটা রোম্যান্টিক কিংবদন্তী আছে। এই ঘোড়সওয়ার প্রেমে পড়ে লেকামেইডেনের। তিনি ছিলেন র্ভেক বলে জায়গাতে। কিন্তু লেকামেইডেন প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ঘোড়সওয়ার রেগে সুদূর থেকেই লেকামেইডেনের দিকে মৃত্যুবান নিক্ষেপ করে। পথে সেই তীর আটকে দেয় টরগ। টরগ পর্বতের বিরাট গহ্বরটা এই করেই হয়ে যায়।

এ ঘটনাই ঘটেছিল আবছা অন্ধকারে। যখন সূর্যদেব ঝলমল করে আকাশে চোদ্দ ঘোড়ার রথে করে এসে হাজির হলেন, তখন এরা সকলেই প্রস্তরে পরিণত হয়ে গেল। এমন কি লেকামেইডেনের সঙ্গে যে সাত বোন ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারাও পর্বতমালায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। এ যেন আমাদের দেশের অহল্যার উপাখ্যানের সঙ্গে কিছুটা মিল রেখে তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়।

নরওয়ের উত্তর দিকের মধ্যরাতের সূর্যাস্তের দেশটা, সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক তেমন উপভোগ্য নয়। কেন না, সমস্ত রাত গোধূলি-লগ্নের মত হয়ে থাকে সেটা ঠিক, কিন্তু এত বেশী উঁচু উঁচু পাহাড় থাকাতে সূর্য পাহাড়ের আড়ালে পড়ে যায়। তাতেই পুরো আলোটা থেকে এই দেশ বঞ্চিত হয়।

যাক, তা সত্ত্বেও নতুনত্ব ত বটেই। আশানুরূপ না হলেও একেবারে হতাশাব্যঞ্জকও নয়।

এসব দিকেই এরা পেয়েছে লৌহ আকর। এর জন্য বিরাট প্ল্যাণ্ট বসেছে ও এক নগরী গড়ে উঠেছে সেখানে। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলছে শিফটে।

আর আছে এখানে এদের বিরাট মাছের ব্যবসা—কারণ অসংখ্য হ্রদ আছে। এখান থেকে সারা ইউরোপ ও আমেরিকাতে এরা মাছ চালান দেয়।

নরওয়ে দেশটার রূপ অশান্ত ও অসমতল। একদিকে আকাশ চুম্বী পাহাড়ের মেলা যা এক শহর থেকে অন্য শহরকে আলাদা একলা করে রাখতে চেয়েছে। আবার অন্যদিকে উদ্দাম সমুদ্র অবিশ্রাম গর্জন দিয়ে তাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। যেখানেই পেরেছে সে ঢুকে আসতে চেষ্টা করছে।

এখানে সমতল ভূমি অতি সামান্য আর শত ভাগের তিন ভাগ মাত্র ক্ষেতখামারের জমি। তাই এ দেশে মানুষের বেঁচে থাকতে গেলে আয়েসকে মনের কোণ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় দিতে হয়।

সমুদ্র ও পর্বত—এই দুটি প্রাকৃতিক প্রকাশ এখানকার মনের উপর সত্যিকারের প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই এদের ভাবধারা, শিল্প, ইতিহাস,

অর্থনীতি সবই প্রকৃতির এই দুটো বিপরীতধর্মী প্রকাশের চারধারে ঘুরছে। সেই জন্যই বোধ হয় সব কিছুর উপর এরা প্রাধান্য পেয়েছে।

তাই এরা একটু সময় পেলেই শহর থেকে ছুটে চলে যায়। পাহাড়ের কোলে কাঠের ঘরে কাঠ কাটে মাছ ধরে। শান্ত পরিবেশ। ঘুরে বেড়ায় ঝোপে, ঝাড়ে জঙ্গলে। কেউ বা বেরিয়ে পড়ে নৌকো করে উত্তাল সমুদ্রের বুকে, উত্তাল তরঙ্গের তালে তালে ভয়লেশহীন মনে।

এদের সাহিত্যে পাই প্রাকৃতিক রূপের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতির কথা। আর কোন ভাষায় ঠিক এমনটা আছে কিনা সন্দেহ।

সঙ্গীতের মধ্যেও একই প্রভাব, মানে সমুদ্র ও পর্বতের। সুরের মূর্ছনায় থাকে এক অনৈসর্গিক সম্মোহনের রেশ যা মানুষকে নিয়ে যায় অপার্থিব কোন সুদূরের আবহাওয়ায়।

বাস্তবভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় এদেশ হচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দেশ। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য তারা একজোটে কাজ করে। সেখানে কোন গোলমাল নেই।

তখনই মনে আসে আমার নিজের ছোট্ট পশ্চিমবঙ্গের কথা। এটা তো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দেশ। দেশের মঙ্গলের জন্য কেন আমরা এক হয়ে কাজ করতে পারি না? সেখানে এখনও আমরা অপারগ। সবার সঙ্গে সবার ঝগড়া, সবার পিছনে সবাই লেগে আছে। সমষ্টিগত বহু কাজ আমরা তেমন পেরে উঠি না।

কিন্তু এই দেশ থেকে এই মহৎ গুণটা আমরা নিতে পারি। তাছাড়া আমরা হতেই বা পারব না কেন? নেপোলিয়ান বলেছিলেন, ইমপসিবেল ইজ এ ওয়ার্ড ফাউণ্ড ইন দি ডিক্সনারি অফ ফুলস।

আমরা বোকা নই—তা আমরা সগর্বে বলতে পারি।

॥ পাঁচ ॥

সুইডেনের কথা মনে হলে প্রথমেই মনে আসে নোবেল প্রাইজের কথা। এই প্রাইজ পৃথিবীবিখ্যাত। এলফ্রেড নোবেল প্রথম ডিনামাইট আবিষ্কার করেন।

এই আবিষ্কারের ফলে ধরণীর চেহারা অনেক বদলে গেছে।

নোবেল তাঁর যথাসর্বস্ব সুইডেনের একাডেমিকে দান করে যান।

সেই দানের অর্থ থেকেই প্রতি বৎসর পৃথিবীর সব চাইতে নামী সাহিত্যিক, স্রষ্টা, বিজ্ঞানীদের প্রাইজ দেওয়া হয়। আজকাল শান্তির চেষ্টার জন্যও প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে।

এরপর পৃথিবীতে আরও অনেক রকম প্রাইজ দেওয়া শুরু হয়। নানাভাবে, নানা বিষয়ে। নোবেল প্রাইজের মত সম্মানিত প্রাইজ কিন্তু কোনটাই নয়।

সুইডেন যে সারা জগতের কল্যাণ চায়, সবার সঙ্গে এক হয়ে থাকতে চায়—এইত তার সব চাইতে বড় প্রমাণ।

সেই যুগে এই দেশের চাইতে ধনী আরো দেশ ছিল। সে সব দেশে অনেক গুণী-জ্ঞানীর জন্ম হয়েছে। কেউ কি এইভাবে সারা বিশ্বকে এক করে ভেবেছে।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ প্রথম নোবেল প্রাইজ পান। পরাধীন ভারতবর্ষ তখন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কবি সত্যেন দত্ত গেয়ে উঠেছিলেন

জগৎ কবি সভায়
মোরা তোমার করি গর্ব ;
বাঙ্গালী আজি
গানের রাজা
বাঙ্গালী নহে খর্ব।

তারপর অনেক বৎসর পরে পদার্থ বিজ্ঞানে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন।

এটাই হচ্ছে সুইডেনের সব চাইতে বড় পরিচয়।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে, ট্রেন থেকে নেমেই এই কথাটা সবার আগে মনের মধ্যে এলো। আর মনে হোল পৃথিবীবিখ্যাত জহরলাল নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নেহরু প্রাইজ দেবার ব্যবস্থা করলেন।

কদিন আর এই দেশ স্বাধীন হয়েছে, কি বা তার শক্তি, কি বা তার ঐশ্বর্য।

এ থেকে আমরা এটাই বুঝি, আমরা বিশ্বেরই একজন। বিশ্বকে আলিঙ্গন করে থাকতে চাই, ভালবাসতে চাই।

তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো।
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

স্টকহোমে নেমে আমাদের তিনজনের আর টুরিস্ট অফিসের সন্ধান করতে হোল না। কোপেনহেগেনে চেনা একটি বাঙালী ছেলে তার চেনা এক ভদ্রমহিলার বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

আমরা প্রথমে প্রাতরাশ সেরে সোজা ঐ বাড়িতে গেলাম। জিনিসপত্র রেখেই বের হলাম শহর দেখার উদ্দেশ্যে।

চারটি দেশকে একসঙ্গে করে বলা হয় স্ক্যানডিনেভিয়া। ডেনমার্ক, নরওয়ে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড।

বেশীর ভাগ সময়ই এরা সব বিষয়ে এক মতে চলে।

লোকেরা এক ধরনের। অবশ্য এরা স্বয়ং সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা দেশ। একজোটে চলাতে পৃথিবীর কাছে একটা আভিজাত্য হয়েছে।

তবে চিরকাল মোটেই একজোটে ওরা চলত না। বরঞ্চ ঠিক উল্টোটাই। নিজেদের মধ্যে সব সময়ই মারামারি চলত।

এমনকি চোদ্দ শতকে সুইডেন নরওয়ে ও ডেনমার্ক একজন ড্যানিশ রাজার নিচে ছিল।

রাজা গুস্তাভ ভাজা যুদ্ধ করে সুইডেনকে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।

এই রাজাকে সুইডেনের জর্জ ওয়াশিংটন বলা হয়।

তারপর অনেক যুদ্ধ হয়েছে ইউরোপ ও রাশিয়ার সঙ্গে। তবে একটা মস্ত বাঁচোয়া ছিল, যা শত্রু পরে পরে।

সাধারণত অন্য দেশেতেই যুদ্ধগুলো হয়েছে। একজনের পর একজন বীর রাজারা এসেছেন ও গিয়েছেন. কিন্তু স্টকহোম সবদিকে উন্নতি করেছে।

নামকরা স্থপতি নিকোডেমাস টেসিন এবং তার ছেলে রয়াল প্যালেস ও ড্রটিংহম প্যালেস তৈরী করে।

রাজা তৃতীয় গুস্তাভের সময় স্টকহোম কালচার সঙ্গীত ও নাটকে খুব উন্নত হয়।

রয়াল প্যালেস তেমন পুরোন নয়। আগুন লেগে পুরোন প্রাসাদ পুড়ে যায়।

এই প্রাসাদে রাজাদের নানা রকম সব জিনিস সুন্দরভাবে রাখা আছে। আর আছে ইটালী থেকে আনা পুরোন অ ত সুন্দর মূর্তি।

এইসব চমক-লাগান প্রাসাদ দেখলে কত রকম ভাব যে আসে মনে।

আমি হিন্দু। আমি জন্ম-জন্মান্তর মানি। তাই মনে হয়, বোধহয় কয়েক জন্ম আগে রাণী ছিলাম বা রাজাই ছিলাম কে জানে?

এটা ঠিক যাই হই না কেন, নিজের ছোট্ট বাংলাদেশের বাইরে কোনদিন জন্মেছিলাম এমন কথা ভাবতেই প্রাণের মধ্যটা যেন কেমন টনটন করে ওঠে।

যেভাবেই জন্মাইনা কেন যেন এই দেশেতেই জন্মাই।

একটা কথা মনে হোল। তখন আমরা দিল্লীতে। আমাদের চেনাজানা দু-একজন বন্ধু বড় এক জোতষীকে নিয়ে হাজির।

ওঁর কাছে নাকি ভৃগুর কিছু নথিপত্র আছে। উনি ত আমার জন্মের সময়ের সঙ্গে ভৃগুর নথিপত্র ঘেঁটে একটা পাতা বের করে আমার অতীতের কথা অদ্ভুত ঠিক বলতে লাগলেন। বাবা কি রকম দেখতে ছিলেন। কি পদমর্যাদার লোক ছিলেন

আমার কবে কোন অসুখ করেছিল, কখন কি ঘটনা ঘটেছিল, হুবহু সব মিলিয়ে দিলেন।

ভবিষ্যতের কথাও বললেন। যাক আমি ত ভাবলাম ভদ্রলোকের যা বলার সব নিশ্চয়ই শেষ হোল। এখন উঠবেন।

তখন উনি বললেন আমার আগের জন্মের কথা বলবেন।

আমি ত একেবারে থ। এ আবার কি কথা। তাড়াতাড়ি বললাম সে দিয়ে আর কি হবে? আপনি নিশ্চয়ই কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

'আমাদের বলতেই হয়। আপনার কোন পাপের জন্য আজকে আপনার এই অবনতি হয়েছে।'

আমি ত শুনে তাজ্জব! আমার ত মনে হয় ভালই আছি আমি। মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে গেলাম ভদ্রলোকের বলবার ঢং দেখে।

কে জানে বাবা, পাপের কথা যখন বলছে. দু-একটা খুন-খারাপিও করে থাকতে পারি। সেই সব কথা বলবে বাইরের সব লোকের সামনে।

মানা করেও রেহাই পেলাম না। ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। বলির পাঁঠার মত বসে হরির নাম জপতে লাগলাম।

উনি বললেন, আমি নাকি আগের জন্মে রাণী, মানে কার্যত রাজা ছিলাম। রাজত্ব চালাতাম।

সব দিকেই ভাল ছিলাম। একটা দোষ ছিল, শিকার করতে খুব ভালবাসতাম ও মাংস খেতে ভালবাসতাম। অনেক পশুহত্যা করেছি। তাই আজ এই অবনতি। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। যাক বাঁচা গেল।

সত্যিই আগের জন্মের কথা মনে হলেই কত কথা মনে হয়। মানুষের সব কিছু জানবার আকাঙ্ক্ষা চিরন্তনী।

ওখানকার ন্যাশনাল চার্চ অনেক পুরনো হলে হবে কি? এত সুন্দরভাবে রাখা যে মনে হয় যেন সেদিনের তৈরী।

বাইরে থেকে যেমন ঝকঝকে ভেতরটাও তাই। এর কারুকার্য অপূর্ব। এখানে অনেক রাজার রাজ্যাভিষেক হয়েছে।

এখনও এখানে মাঝে মাঝে ভাবগম্ভীর উৎসব হয়। সেখানে রাজারাণী উপস্থিত থাকেন।

আমাদের দেশের মাউন্ট আবুর জৈন মন্দিরের কারুকার্যের সঙ্গে রোমের চার্চ ছাড়া ইউরোপের আর কোনও চার্চের কারুকার্য বোধ হয় তুলনা করা যায় না।

যদিও জৈন মন্দির এসব চার্চের তুলনায় অনেক আগের তৈরী।

হিন্দু রাজত্বে স্থাপত্য বিদ্যার আমাদের দেশে যতখানি প্রসার হয়েছিল ও উন্নতি হয়েছিল তা বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি।

তাই আজ এতদিনের পরাধীনতা, এতদিনের লুপ্ত গৌরব, এতখানি পিছিয়ে-পড়া সত্ত্বেও ভারতের ঐতিহ্যের কথা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হচ্ছে।

এইখানে ঘুরে ফিরে মনে হোল মানুষকে মানুষের কাছে টানবার সব চাইতে বড় সহায়ক হচ্ছে ভাষা।

এই ভাষার মাধ্যমেই ত আমরা একে অন্যের কাছের হতে পারি।

এখানে ইংরাজী কম্পালসারী হওয়াতে আর আমরাও ইংরাজীনবীস হওয়াতে পরদেশের সবচাইতে বড় অসুবিধা বোধ করছিলাম না।

আমাদের ইংরাজী শুনে কেউ পিছিয়ে যাচ্ছিল না। এগিয়ে আসছিল বোঝাতে।

এটা ঠিক ইংরাজী ওরা স্কুলে কয়েক বৎসর মাত্র শেখে তাই আস্তে আস্তে ভুলতে আরম্ভ করে।

তবুও ত ধারণা একটা ঠিকই থেকে যায়। তাই যখনই যেখানে গেছি টুকটাকি খবর সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয়নি।

এখানে একটা বিশেষ জায়গা সত্যিই অপূর্ব। স্কানসেন।

যদি সারা সুইডেন ঘুরে বেড়াবার কারও সময় হাতে না থাকে, তবে এখানে আসলেই সারা দেশটার কালচার ও ট্রেডিশন সম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা হয়ে যাবে।

সব জায়গা থেকে আস্ত ফার্মবাড়ি, পাথরের ঘর ও অন্যান্য তৈরী জিনিস তুলে এনে এখানে সুন্দর করে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাখা হয়েছে।

এখানে একটি অতি পুরোন চার্চ রাখা আছে। এই চার্চ এখনও

উপাসনা হয়। বিয়ে হয়। অন্যান্য অনেক তুলে-আনা বাড়ি এখনও ব্যবহারে লাগে।

স্কানসেন ঘুরতে ঘুরতে কানে এলো মিষ্টি স্বর, 'তোমরা অনেক দূর দেশ থেকে এসেছ, না? তাই ইংরেজীতে বললাম। বিদেশী ভাষা আমাদের স্কুলে শেখাচ্ছে। তোমরা বোঝ?'

ভাঙা ভাঙা ইংরেজী মিষ্টি সুরে কানটা যেন জুড়িয়ে গেল।

'আমরা জানি।'

'তোমরা ত একটু বেশী ভাল জান মনে হচ্ছে। আমার ভুলভাল শুনে আবার হেসো না।'

বললাম, 'বারে হাসব কেন? এত তোমার ভাষা নয়, ভুল বলাটাই স্বাভাবিক। আমরাও বলি।'

আমার কথা শুনে মনে হোল মেয়েটি আশ্বস্ত হোল। আমাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কত কিছু বলে গেল।

ওর নীল চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল ঐ নীল চোখের গভীরতা নীল আকাশের গভীরতার চাইতে কম কিসে।

সোনালী চুলে ঢেউ তুলে অনুর সঙ্গে কত কিছু বলে যাচ্ছিল।

মেয়ে আমার ওর চাইতে বড়। তা সত্ত্বেও ঐ ত ওর কাছাকাছি, তাই ভাব জমতে সময় লাগল না।

মেয়েটি সঙ্গী হওয়াতে স্কানসেন জায়গাটি স্মৃতি-মধুর হয়ে মনে গেঁথে আছে।

এতে বেশ বুঝি মানুষ মানুষের সান্নিধ্য কত চায়। আবার মানুষের শত্রুতা করতেও কত চায়। বিচিত্র এই মনুষ্যজাতি।

এখানকার রাজকুমার ইউজিন মস্তবড় চিত্রশিল্পী ছিলেন।

আমাদের রাজকুমার রবি বর্মার মত। রাজকুমার ইউজিন ছিলেন রাজা পঞ্চম গুস্তাভের ভাই।

ইউজিনের মৃত্যুর পর ওঁর প্রাসাদ জনসাধারণকে দান করা হয়। এটি ছবির মিউজিয়াম হয়। এখানে ইউজিনের আঁকা ছবি ও আর সব সুইডেনের চিত্রকরদের আঁকা নামী ছবি রাখা রয়েছে।

এর চারিপাশের বাগানও খুব সুন্দর।

ত্রিভান্দ্রামে গিয়ে রাজকুমার রবি বর্মার আঁকা ছবির মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম।

এক একটা ছবির দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়েছে জীবন এত ছোট কেন? একসময় রবি বর্মা এইদিকে ভারতবর্ষে বেশ উপরে স্থান নিয়েছিলেন।

মনে হয় পৃথিবী এত সুন্দর। এত কিছু এখানে দেখবার আছে। সৃষ্টিকর্তা কত ভেবেছেন, এটা করতে। কোন দুটি জিনিস একরকম নয়।

সময় দিয়েছে কম। এর মহিমা বুঝতে বুঝতেই দিন ফুরিয়ে আসে।

এখানকার সিটি-হল দেখে বিস্ময় লাগল। এই ধরনের স্থাপত্য দুর্লভ। এখানে ষোল শতাব্দীর সুইডেনের স্থাপত্য ও ক্লাসিক রোম ও গ্রীসের স্থাপত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছে। তার সঙ্গে মুরিশ স্থাপত্যেরও আভাস পাওয়া যায়।

প্রিন্সেন গ্যালারিতে রাজকুমার ইউজিনের তৈরী মিউরাল ছবি রয়েছে ড্রটিংহমের রাজপ্রাসাদে। হ্রদ মালারের মধ্যে একটি দ্বীপে। এই দ্বীপের নাম হচ্ছে রাণী দ্বীপ। নৌকো করে ওখানে যেতে বড় ভাল লাগছিল।

সকালে উঠে মেয়ে ও আমি বেশ পেটভরা সকালের খাবার তৈরী করে ফেলা গেল।

আগেই বলেছি, যে ভদ্রমহিলার বাড়িতে উঠেছিলাম, এত আপন আপন হয়ে গিয়েছিলেন যে নিজের রান্না ও ভাঁড়ারঘর আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

নিজের বাড়ির মত মনের খুশীতে খেয়ে ভদ্রমহিলাকেও খাবার দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম স্কারহোমেনের দিকে।

॥ ছয় ॥

স্টকহোমের সবচাইতে নতুন শহরতলি হচ্ছে স্কারহোমেন।

এখানে চলন্ত ফুটপাত আছে। অনেক লোকই মনে করে এটা হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় বিলাস।

বেশী টাকা আছে তাই এইসব আবোল তাবোল করছে। যারা বয়স্ক তারা বা পঙ্গুরা কিন্তু এটা অন্যভাবে নেয়।

স্টকহোমে যেটা সবচাইতে আগে চোখে পড়ে, তা সুন্দর সুষ্ঠু প্ল্যানিং।

প্রত্যেকটি বাড়িই অতি সুন্দরভাবে বানানো, তা বড়ই হোক আর ছোটই হোক। খুঁত তুমি কোথাও পাবে না। মনে হয় সবাইকে এখানে স্থপতি করে পাঠিয়েছেন ভগবান। এটা যেন এদের দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে।

যেটা চোখকে পীড়া দেয়, তা যেন ওরা কোন যুগেই করতে পারেনি, পারবে না।

আর আমরা কি ? দেশটাকে ছন্নছাড়া করে রেখেছি। বড় ছোট ভ্রূক্ষেপ নেই। যে যেখানে যা খুশী করছে। যেখানে যা খুশী নোংরা করছে, ভাঙছে চুরছে।

আমার তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হয় দেশটা যেন আমাদের অসহায় সৎমা। তাকে খুবলে খুবলে খাও। তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেল। কুছ পরোয়া নেই। হায়! ভগবান কতদিন আরো আমরা এই ভাবে চলব।

তারপরই আমরা কোচে করে পূর্ব দিকে রওনা হলাম।

আমার পাশেই বসেছিলেন একটি প্রৌঢ়া আমেরিকান ভদ্রমহিলা। বেশীর ভাগ আমেরিকান টুরিস্টদের মত মোটেই নন।

এই দেশের বিষয় অনেক পড়াশুনা করে এসেছেন। স্বামী ছিলেন প্রফেসার। অল্পদিন মারা গেছেন। আগে এসেছিলেন দুজনে। ছেলেমেয়ে নেই। এবারে এসেছেন একা। এই দেশের কথা অনেক বলেছিলেন ও আমি মনের খাতায় টুকে রাখছিলাম। তাই ত এখন কেমন বিদ্যা ফলাতে পারছি।

আসল কথাতে ফিরে যাই। ভদ্রমহিলার মানসিক উৎসাহ ও জোর দুটোই শিখবার মত। স্বামীর কথা বলছিলেন দুঃখ করে নয় আনন্দ করে। "আমরা দুজনে অনেক বৎসর সুখে দুঃখে আনন্দ করে কাটিয়েছি।'

আগে পরেই যেতে হবে। আমি একা পড়ে গেছি ঠিকই, কিন্তু এত কিছু জানবার ও শিখবার বাকি রয়ে গেছে যে সেই ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে কখন ডাক এসে যাবে অজান্তে বোধ হয় টেরই পাব না।

বসে দুঃখ করবার মোটে সময় নেই। তাই যখনই ভাবি তার কথা, শুধু শান্তির দিনগুলোই মনে আসে আর মন আনন্দে ভরে যায়।"

এইসব টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা থেকে কত কিছু অমূল্য ধন পেয়েছি তার শেষ নেই।

পূর্ব সুইডেন রুক্ষ পাহাড় আর নোনা জলের সংমিশ্রণ। বনবাদাড়, পাহাড় আর নোনা জলের সাগর এই তিনটি প্রাকৃতিক জিনিস আলাদা করে ভাবতে মনটাকে ঠিক টানে না। কিন্তু যে এই তিনটি একসঙ্গে দেখেছে তার মনে হবে এর একটি আলগা সৌন্দর্য আছে যা মনকে কেড়ে নেয়।

যারা এখানে থাকে তাদের মনে হয় প্রকৃতি এদের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে।

মাটি এত শুকনো, ফসল হওয়া শক্ত, তাছাড়া জলের অভাব। এই রকম জায়গার নাম সুইডিশরা দিয়েছে আরকিপেলাগো।

এখানকার লোকেরা ত ভাইকিংদের বংশধর। তাই তারা হার মানতে শেখেনি। ভাইকিংরা এত দুর্দান্ত ও দুর্দমনীয় ছিল যে ঐটুকু রাজ্যের অধিবাসী হয়েও সারা ইউরোপ ও রাশিয়ার লোকদের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে রেখেছিল।

আমরা বাঙালীরা যেমন মারাঠা দস্যুর ভয়ে আধমরা হয়ে থাকতাম। আই সেই যুগে ছেলে-ভোলান কত ছড়া ছিল বর্গীদের নিয়ে। সেই ভাইকিং-এর বংশধররা প্রকৃতির কাছেও হার মানেনি। এটা বলে আমাদের মত হা-হুতাশ করেনি যে আমাদের মিনারেল্‌স নেই, পেট্রল নেই, আমরা কি করব।

তারা সমুদ্রের ধারে ধারে এত সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট টাউনশিপ গড়েছে যে সারা পৃথিবী থেকে লোকে ওখানে ছুটি কাটাতে যায়। রাস্তাঘাট, হোটেল ইত্যাদি সব কিছুই তারা করেছে, যাতে লোকদের মন ভরে। তাই টুরিস্টদের কাছ থেকে ওরা অনেক রোজগার করে। তাছাড়া আছে সেখানে মাছের ব্যবসা। সমুদ্রের ঝড়ঝাপটা তুফান কিছুই তারা গ্রাহ্য করে না। শক্ত সমর্থ সাহসী জেলেরা মাছ ধরে পাগলা সমুদ্র থেকে।

দুস্তর মরুভূমি, দুর্গম গিরি কোন কিছুই এদের চলার পথে কাঁটা দিতে পারেনি।

অনেক আগে হ্রদ মালারের বারকা দ্বীপটি ছিল সুইডেনের রাজধানী। সেই সময় সুইডেন পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী দেশদের মধ্যে অন্যতম। এই বারকার ভিতর দিয়েই পশ্চিম দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য চলত।

এইখানেই প্রথম খৃস্টধর্মের প্রচার হয়েছিল। সেন্ট আনসার ভাইকিং রাজাকে এখানেই খৃস্টান করেছিলেন। এই জায়গা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই এখানে দাঁড়িয়ে শুধু স্মৃতির ভিতর দিয়ে তাকে অনুভব করা যায়।

আমাদের তমলুক গেলে এই ভাবই মনে আসে। একসময় এই জায়গা ছিল কতবড় বাণিজ্যকেন্দ্র। নানা দেশ-বিদেশ থেকে এখানে কত কিছু আমদানি রপ্তানি হোত। কত কর্মব্যস্ত জায়গা ছিল। আর আজ?

কিছুই বোঝবার উপায় নেই। পৃথিবীর সব কিছুই ঠিক এই হয়। আজকের সব কিছু কালকে মিলিয়ে যায়।

উপসালা বলে জায়গাতে স্ক্যানডিনেভিয়ার সব চাইতে পুরোন ইউনিভারসিটি আছে। এখানে ওয়ালপুরগিস ইভ নামে প্রতি তিরিশে এপ্রিল একটি উৎসব হয়। এটা হচ্ছে বসন্ত উৎসব।

স্ক্যানডিনেভিয়ার ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে এসে হাজির হয়। ঠিক বেলা তিনটার সময় ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ হয়, আর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সাদা টুপি মাথায় দিয়ে মার্চ করে ড্রটিনগার্ট দুর্গের দিকে যেতে থাকে। এইদিনটি এখানকার একটি জাতীয় ছুটির দিন। সারা দিন নানা রকম আনন্দের মধ্যে কাটে।

রাতের দিকে আরও সুন্দর উৎসব হয়। হাজার হাজার ছেলে-মেয়েরা জ্বালানো টর্চ হাতে মার্চ করে দুর্গের সবচাইতে উঁচু জায়গাতে গিয়ে উপস্থিত হয়।

উপসালা ইউনিভারসিটির ছাত্রদের প্রেসিডেন্ট বক্তৃতার ভেতর দিয়ে বসন্তকে আবাহন করেন।

তারপর অগুনতি ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে বসন্তের গান করে। পরে ওরা বাড়িতে হোটেলে ক্লাবে আনন্দ করতে ছড়িয়ে পড়ে। এইসব শুনে এত ভাল লাগল।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম দিনটির কথা ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে যে ভাবে শুনেছিলাম ঠিক সেইভাবেই লিখলাম।

সত্যি আমাদের দেশেও সব ছাত্র ছাত্রীরা মিলে যদি এই রকম একটা উৎসব করে নাচে, একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করে, কি অপূর্ব জিনিস হবে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই ত কত ইউনিভারসিটি আছে। বৎসরে একদিন সবাই একসঙ্গে হয়ে উৎসব করতে ত পারে! এতে মনের আদান-প্রদান হয়, ডিসিপ্লিন হয়, সমপ্রাণতা হয়। অনেক কিছু হয়, শুধু আনন্দের মধ্যে দিয়ে।

স্টেশনের কাছেই সুইডেনের সব চাইতে পুরোন ক্যাথিড্রেল। এই ক্যাথিড্রেলেই রাজা গুস্তাভ ভাজা, যিনি সুইডেনের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন, তাঁর ও তাঁর দুই রানীর কবর আছে।

এখানকার লাইব্রেরী খুব নামী।—পঞ্চম শতাব্দীর পুরোন রুপোর বাইবেল এখানে আছে। গথিক লিপিতে লেখা। বড় অক্ষরগুলো সোনা দিয়ে লেখা। আর বাকি সব রুপো দিয়ে।

আমি যখন ছোট তখন গ্রেটা গার্বোর 'কুইন ক্রিসটিনা' ফিল্ম দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সুইডেনের রানী মানে সত্যিকারের রানী। রাজার রানী নয়। যার এক আঙুলের হেলনে তার রাজ্যে সবকিছু নিমেষে পাল্টে যেতে পারত, সেই রানী তার রাজত্ব ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে।

রাজা এডলফাসের একমাত্র সন্তান রানী ক্রিসটিনা এই লাল দুর্গের দেওয়ানী আমে দাঁড়িয়ে মাথার মুকুট খুলে রাখেন।

এই যুগে তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারেন রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড। কিন্তু ভারত আড়াই হাজার বৎসর আগে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। গৌতম বুদ্ধ অবশ্য পার্থিব কোন কিছুর জন্য রাজ্য ছেড়ে যাননি। গিয়েছিলেন অপার্থিবের সন্ধানে।

তাই মনে হয় আমাদের ভারতবর্ষের মন যেন বড় উঁচু সুরে বাঁধা ছিল, যার নাগাল পাওয়া কঠিন। তাই আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের নিয়ে মনে মনেই তাল গুনে যাচ্ছি। স্বপ্ন রচে যাচ্ছি। তাদের কাহিনী শুনছি। তাদের কথা ভাবছি। কিন্তু নিতে পারছি না।

তবে তাদের থেকেই ত আমাদের উৎপত্তি। তাই একদিন না একদিন তাদের নাগাল আমরা পাবই।

পৃথিবীর বেশীর ভাগ বলতে গেলে সব পুরোন দুর্গই যার যার দেশের সরকারের তত্ত্বাবধানে। স্টকহোমের পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে স্ককলস্টার শহরের দুর্গটি কিন্তু এখনও সরকারের হাতে যায়নি।

এটি একটি বিশেষ লোকের বা বিশেষ পরিবারের। রাজা গুসটভাস এডলফাসের সময়ে তারই এক বিশেষ জেনারেল রেঙ্গেলের ছিল এটি।

এরপর এই দুর্গ তাঁর আত্মীয়ের কাছে যায়।

বিশ বৎসর পর এসেন্স নামে তার আরেক আত্মীয়ের হাতে যায়

এবং এখনও আছে। এতে অনেক কিছু দেখবার আছে। বিশেষ এর লাইব্রেরী।

এর পাশাপাশি নিজের দেশের পুরোন সব জিনিসের কথা মনে হোল। যেসব জিনিস সরকারের হাতে গেছে সেইগুলোই শুধু সুরক্ষিত।

বাকি সব অমূল্য জিনিসের অবস্থা শোচনীয়। গরীব দেশে কোথায় এমন বড় লোক আছে যে এক আধটার দায়িত্ব নিয়ে ভালভাবে রাখবে।

তাছাড়া শুধু বড়লোক হলেই ত হবে না। সংস্কৃতি মন, অবস্থা সব কিছুর সমন্বয় চাই। তা যে এই দেশে বলতে গেলে দুর্লভ।

তাছাড়া দেশ গরীব। তাই তার সরকারও গরীব। তারই বা সাধ্য কতটুকু?

। সাত ।

স্টকহোমে নিজেদের আস্তানায় ফিরে এসে মন ও শরীর দুই-ই একটু বিশ্রাম পেল।

এই ক'দিন অনেক ঘুরেছি দেখেছি ও শিখেছি। তাতে এই দুটিই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

যে মহিলার বাড়িতে আমরা উঠেছিলাম তাঁকে দেখলে ও তাঁর ব্যবহারে মনে হয় উনি যেন সবাইকে ভালবাসতে জন্মেছেন।

বেশ অবস্থাপন্ন। একটি ছেলে দূরে চাকরি করে। স্বামী নেই। একাই থাকেন। বন্ধুরা সমানেই আসেন; বড় বাড়ি।

একা থাকতে ভালবাসেন না। তাই একটি অস্ট্রিয়ান ছেলেকে বাড়িতে রেখেছেন। ছেলেটি স্টকহোমে চাকরি করে। ছুটি-ছাটাতে দেশে যায়।

আরেকটি ঘরে এসে প্রায়ই থাকে একটি বাঙালী ছেলে। এখন আছে কোপেন-হেগেনে। পরে স্টকহোমে এসে থাকবে। ভদ্রমহিলাকে মা বলে ডাকে।

সেই আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। দুজনেই অবশ্য টাকা দিয়ে থাকে।

ওসব দেশে শত আত্মীয় হলেও বিনা পয়সায় থাকার রেওয়াজ নেই। তবে যতটা টাকা নেবার কথা তার চাইতে অনেক কম নেন। নিজের বাড়ির মতই তারা থাকে ও ভদ্রমহিলাকে দেখাশোনা করে।

একজন হেল্পিং হ্যাণ্ড আছে। একটি মেয়ে এসে সকালে সারা বাড়ি পরিষ্কার করে, বাজার করে ও রান্না করে রেখে চলে যায়।

ভদ্রমহিলা ত আমাদের সঙ্গে এত আপন আপন ভাব করলেন যে মনেই হোল না যে বিদেশিনীর বাড়িতে আছি।

এবার আমরা চললাম সুইডেনের দক্ষিণ দিকে। এদিকটা অন্যান্য দিকের তুলনায় অনেক বেশী উর্বরা।

এদিকটাকে বলা হয় সুইডেনের শস্যভাণ্ডার। এদের নিজস্ব ডায়লেক্ট চলতি ভাষা আছে। আর আছে নিজস্ব কালচার। এদিককার একটি জায়গা স্লেকিনসে তাকে বলা হয় সুইডেনের বাগান। তাতেই বুঝতে পারছেন কি ব্যাপার।

এত সুন্দর দেশ সুইডেন। সেই দেশের লোক যখন জায়গাটিকে আদর করে নাম দিয়েছে—'সুইডেনের বাগান'।

এই দেশের উত্তর দিকটা কিন্তু অন্য রকম—পাহাড়ী জঙ্গলী ও পাথুরে।

একটা গল্প আছে যে ভগবান যখন দক্ষিণ দিকটা সুনিপুণভাবে গড়তে ব্যস্ত ছিলেন শয়তান লুকিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে জায়গাটা খারাপ করে বানিয়ে ফেলে।

ভগবান যখন এই অবস্থা দেখেন তখন উনি বললেন—'ঠিক আছে। যা হয়ে গেছে তা ত আর কিছু করা যাবে না। তবে তার জন্য কিছু নয়। আমি মানুষদের বানাব।'

উনি তাই করেছিলেন। এখানকার লোকদের এমন শক্ত সমর্থ একনিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু করেছেন যে এই পাথুরে জায়গাকে খুব সুন্দর ধনী ও সত্যিকারের বাসযোগ্য স্থানে পরিণত করেছে।

ওখানে অনেক ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাঁচের কারখানা।

এই দিকটা সতের শ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল ডেনদের হাতে।

তারপর এটা সুইডেনের সঙ্গে জড়িত হয়।

এতকাল ডেনমার্কে ছিল বলে ডেনমার্কের ভাষা ও কালচারের প্রভাব বেশ বোঝা যায়। এখনো এখানকার লোকরা কোপেন-হেগেনকেই বেশী কাছের মনে করে।

তারপর আমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স চললাম সুইডেনের লেক ডিস্ট্রিকটের দিকে। এটা হচ্ছে গথেনবার্গের উত্তর ও পূর্ব দিকে।

এখানে হাজার হাজার ছোট ও মাঝারি মাপের হ্রদ ভ্যাটার্ন ও ভেনার্ন আছে।

এখানে গথরা বাস করছে প্রায় চার হাজার বছর ধরে।

রাজকুমার ভিলহেলস এখানকার রাজার ছেলে ছিলেন। তিনি বহুগ্লান নামে একটি সুন্দর দ্বীপ আবিষ্কার করেন ও পৃথিবীর সঙ্গে এর পরিচয় করিয়ে দেন।

রাজকুমার তার বাবা রাজা পঞ্চম গুস্তাভের সঙ্গে ওখানে গিয়েছিলেন এবং ছিলেন।

উনি এত উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন আস্তে আস্তে সারা বিশ্বের দৃষ্টি এর উপর পড়তে আরম্ভ করে।

এরই একটু পুরানো শহর নরওয়েজিয়ান রাজার দ্বারা বানানো।

রাজা দ্বিতীয় অসকার এই জায়গায় প্রতি বছর আসতেন।

কিছু বছর পর থেকে ওর বড় সাধের জায়গাতে আর আসা হয়নি। অজানায় পরপারে উনি চলে গিয়েছেন।

সবাই বলে— ওখান থেকে আসা সম্ভব নয় বলেই আর উনি আসেন না। না হলে পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে এখানে আসা থেকে আটকাতে পারত না।

এখনকার অস্টার গটল্যাণ্ড প্রভিন্সেই লেক ভেনার্ন সাত শ পঞ্চাশ মাইল জুড়ে। এত বড় মিষ্টি জলের হ্রদ খুব কমই আছে। এরই কাছে অনেক বড় বড় শিল্প উদ্যোগ গড়ে উঠেছে।

পশ্চিম দেশে একটা জিনিস খুব লক্ষণীয়। যেখানেই কোন ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠবার সুযোগ আছে সেই সব জায়গার সুযোগ তারা নিয়েছে। আধখেঁচড়াভাবে নয়—প্ল্যান্ড ভাবে তারা এগিয়েছে।

কাউকে যেমন তেমনভাবে বসতে দেয়নি। যা তা করে কিছু বানাতে দেয়নি।

সুন্দর সুচারুভাবে নগরী গড়া হয়েছে এবং যাদের সেখানে বসতে দেওয়া হয়েছে তাদেরও সেটা মনেপ্রাণে বুঝতে হয়েছে যে সেই

নগরীকে ভালবাসার অধিকার তাদের আছে, কিন্তু নষ্ট করবার অধিকার তাদের নেই।

আমাদের যেটা সব চাইতে দুঃখের ব্যাপার হয়েছে সেটা হচ্ছে যে মাটিকে, দেশকে আমরা বহু যুগ ধরে ভালবাসতে ভুলে গেছি।

দীর্ঘ বহু দীর্ঘ কালের পরাধীনতার অভিশাপ। ইতিহাস পড়লেই দেখতে পাই আমরা নিজেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের দেশকে পরের ক্রীতদাসী করে বিক্রি করেছি।

যে দু-চার জন এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাদের সর্বনাশ করতে আমাদের মধ্যে অনেকেই পিছপা হয়নি। সেই লোকদের বংশধররাও আমার দেশের মানুষ।

তাই বোধ হয় সেই কথাটা যতই ভুলতে চাই পদে পদে সকলের চাল-চলন ও ভাবধারা তা বেদনাদায়ক ভাবে মনে করিয়ে দেয়।

ছোট্ট জায়গা গ্রানা। তার নাম পৃথিবীতে সব যুগের সব শিক্ষিত লোকের মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি দেবে। এখানকার লোক আন্দ্রে আরো দুজনকে নিয়ে প্রথম আকাশপথে উত্তর মেরুতে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছিলেন।

ওঁরা বেলুনে করে রওনা হয়েছিলেন। তাঁরা কোথায় যে হারিয়ে গেলেন কেউ তার কোন সন্ধান পায়নি। প্রায় তিরিশ বছর পরে তাঁদের মরদেহ পাওয়া যায়। স্টকহোমে আন্দ্রেকে সসম্মানে কবর দেওয়া হয়।

এদিককার হ্রদনগরীগুলি বেশীর ভাগই বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রির জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য যে এক সঙ্গে এমনভাবে হতে পারে ও থাকতে পারে তা ভারতবাসীদের কাছে এক অভাবনীয় ব্যাপার।

আমরা জানি দেখি ও ভাবি—যেখানে কলকারখানা গড়ে উঠবে বা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজ্‌ড হবে সে জায়গাগুলি হবে ছন্নছাড়া।

তাই বড় ইচ্ছা করে আমাদের দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীদের এখানে পাঠাতে চোখ কান খুলে দেখবার ও শিখবার জন্য।

এইভাবে তাদের গড়তে হবে। দেশকে ভালবেসে তার কাছ থেকে সুবিধা নিতে হবে।

সুইডেনের উত্তর দিকে হচ্ছে ল্যাপল্যাণ্ডের একটা অংশ। এইভাবে নরওয়েরও একটি দিকে ল্যাপল্যাণ্ড।

ফিনল্যাণ্ডেরও তাই।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ল্যাপরা হচ্ছে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার আদিবাসী।

আবার কারো কারো মতে ওদের হচ্ছে মঙ্গোলিয়ান অরিজিন। আজকাল অবশ্য বৈজ্ঞানিকরা বলেন এরা এসেছে মধ্য ইয়োরোপ থেকে হাজার হাজার বছর আগে।

যেখান থেকেই এসে থাকুক স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লোকদের সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই। চলন, বলন, আকৃতি প্রকৃতি সবই সম্পূর্ণ আলাদা।

সব জায়গার ল্যাপদের একসঙ্গে করলেও তাদের সংখ্যা অতি সামান্য। সুইডেনে ৮০০০, নরওয়েতে ২০০০০ আর ফিনল্যাণ্ডে ২৫০০। রাশিয়াতে হাজার কয়েক।

এদের মধ্যে অল্পসংখ্যক হচ্ছে যাযাবর। এক জায়গাতে বেশী দিন থাকে না। সদলবলে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে।

এরা সব দিক দিয়েই রেইন ডিয়ার বল্গা হরিণ বলে এক রকম হরিণের উপর নির্ভর করে। এই হরিণের দুধ খায়, মাংস খায়। আবার এর টানাগাড়িতে বরফের উপর দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যায়।

এই হরিণের চামড়া দিয়ে পোশাক-আশাক বানায়। তাই এই হরিণ এদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে।

অনেকের ধারণা এদের কোন কালচার নেই। এটা কিন্তু নিতান্তই ভুল ধারণা। ওদের নিজস্ব কালচার আছে।

ওরা যত তাড়াতাড়ি যত বেশী ভাষা শিখতে পারে খুব কম লোকই তা পারবে। এরা সকলেই নিজের ভাষা ছাড়া সুইডেন, নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডের ভাষা জানে। এমনকি অনেকে আরও ভাষা জানে।

ওদের নিজস্ব পোশাকের রং লাল, নীল এবং হলদে। কারুকার্য-করা জামা-কাপড় পরতে ওরা ভালবাসে। কাটা নামে একরকম তাঁবুতে ওরা বাস করে।

ওদের ঐশ্বর্য নির্ভর করে বল্গা হরিণের সংখ্যার উপর। কিছু কিছু ল্যাপ এই হরিণের কল্যাণে খুবই ধনী।

এখান থেকে সেখানে যেতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে। তবে অল্প বয়সীর হরিণ সঙ্গে করে মাটির উপর দিয়েই যায়।

ল্যাপরা সুইডেনের আইন অনুসারে সুইডিশদের মত সমান অধিকারে অধিকারী। সরকার তাদের জন্য বিশেষ রকম স্কুল করে দিয়েছে। এবং স্কুলে পড়া বাধ্যতামূলক।

ওদের মধ্য থেকে একজন নামকরা শিল্পী বেরিয়েছেন। এবং বেশ কয়েকজন ইউনিভারসিটির প্রফেসার। তবে ওদের যত মাথাই থাকুক না কেন, যত পড়াশুনোই করুক না কেন ওরা, ওদের নিজস্ব জীবন যাত্রাই পছন্দ করে।

যখন দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর রেওয়াজের মাত্র শুরু ও স্কীইং এরও আরম্ভ সেই সময় ল্যাপল্যাণ্ডের পাহাড়ী জায়গাগুলি প্রথম মানুষের নজরে আসে।

এইখানে প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো পেইন্টিং পাহাড়ের গায়ে আঁকা পাওয়া যায়। তাতে মানুষ আর পশুর আকৃতি দুই-ই আঁকা আছে।

আরেকটি দেখবার জিনিস হচ্ছে বরফের সমুদ্র। মানে, এই সমুদ্রের জল কোন দিন গলে না। তারা পর্বতে পৃথিবীর স্কী চ্যাম্পিয়ানশিপ হয়েছিল। তাই যারা স্কী করে তাদের কাছে এটা খুবই পছন্দের জায়গা।

ল্যাপল্যাণ্ড এত দূরে যে মনে হয় এই দূরত্ব পেরিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য। স্টকহোম থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে কিন্তু এক রাত্রের যাত্রা। না, তা অবশ্য নয়। তার চাইতে একটু বেশী। দুপুরে ট্রেনে চড়লে পরদিন দুপুরে তুমি পৌঁছে যাবে।

উঠলাম ত তিনজনে ট্রেনে ল্যাপল্যাণ্ড প্রভিন্সে যাবার জন্য। মনটা বেশ দোনামোন' করছিল। যাকে বলে যাব কি যাব না। শেষ পর্যন্ত মনের পাল্লাটা যাওয়ার দিকেই ঝুঁকল। পরিণতি—ট্রেনে জুত হয়ে বসা।

যা থাকে বরাতে চোখ-কান বুজে ত পৌছানো যাক কিরুনাতে। একটা বাঁচোয়া শুনেছি যে ওখানকার লোকরা ইংরেজী জানে।

'এই একটা মাত্র হাতিয়ার ভরসা করেই ত চলেছি।'

'কি বিরাট প্রভিন্স এটা, বলত ? সারা সুইডেনের এক-চতুর্থাংশ।'

'তুমি কিন্তু গাইড হিসাবে অনেকটা কাজ করতে পারবে।'

'কি রকম ?'

'যখনি যেখানে যাওয়া ঠিক হয় দেখি লাইব্রেরী থেকে বইয়ের পর বই আনছ আর তুমি পড়ে চলেছ। তখন তোমাকে দেখলে কি মনে হয় জান ?'

'বইয়ের পোকা। তাই না ?'

'না। মনে হয় পড়ার সময় সুযোগ পাওনি বলে এখন সেটা সুদে-আসলে পূরণ করবার চেষ্টা করছ।'

'ঠিক ধরেছ। কিন্তু পারি আর কতটুকু।'

'মনে বলি, ভগবান যে সুযোগটা আগে দেননি তা যেন হাত উপুড় করে দেন আর তুমি যেন দীর্ঘকাল ভাল স্বাস্থ্যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে নিতে পার।'

কথাটা শুনে মনটা এত ছুঁয়ে গেল যে কিছু না বলে চুপ করে রইলাম।

মেয়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

দুজনেই কথা হচ্ছিল। ট্রেনের ভিতর থেকে মাইলের পর মাইল বনভূমি দেখা যায়। বোঝা যায় যে এই জায়গার জন্যই সুইডেন আজ পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী কাগজ উৎপাদনকারী দেশদের অন্যতম।

আমরা তো এসে কিরুনাতে নামলাম। এইটি এখানকার সব

চাইতে বড় শহর। সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় শহর।*

লণ্ডন, নিউইয়র্ক ও ওইরকম আরো অনেক শহর একসঙ্গে করলে কিরুনার সমান হবে।

নেমেই আমরা একটি আস্তানার সন্ধানে গেলাম। এখানেও ব্যবস্থা বলতে গেলে ইউরোপের আর সব দেশের মত সুষ্ঠু। নির্ধারিত জায়গাতে জিনিসপত্র রেখে ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম।

থাকব ত সর্বসাকুল্যে কয়েকদিন, মানে দু' তিনদিন। এই কথাটা আমি আগেও লিখেছি।

এই জন্য ল্যাপল্যাণ্ড হচ্ছে টুরিস্টদের রামরাজত্ব। কম খরচে বেশী আদায় করা যায়। মানে একদিনের খরচে দু'দিন দেখা।

এই দেশে জুন মাসের বার তারিখ থেকে জুলাই মাসের চার তারিখ পর্যন্ত সূর্য অস্ত যায় না। আরো এগিয়ে গেলে এমন জায়গা আছে যেখানে ছাব্বিশে মে থেকে আঠারও জুলাই পর্যন্ত সূর্য ডোবে না। এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার। মনে হয় এ যেন একটি সৃষ্টিছাড়া দেশ। পৃথিবীর নিয়ম এখানকার জন্য নয়। সূর্যের আলোয় তুমি মাঝ রাতে ঘুরে বেড়াও, তাই ঘুমোবার মত মন নেই।

ভাবতেই গাটা শিরশির করে উঠল। গায়ে তেল মেখে রোদ পোয়ায় যে দেশের লোক, সেই দেশের মানুষ চলেছি পৃথিবীর বরফের মুকুটের দিকে। বরফে ঢাকা দেশে চলেছি আমরা বাঙালী।

॥ আট ॥

আমাদের ফিনল্যাণ্ড যাবার প্ল্যান ছিল না। সেই রকম ঠিক রেস্তও নিয়ে বের হইনি।

মেয়ে কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ল। এতদূর এসে ফিনল্যাণ্ড যদি না যাওয়া হোল তবে আর কি হোল?

ও যখন মিষ্টি মিষ্টি করে বলে তখন সেটা না শোনার শক্তি আমাদের থাকে না। তাই পুঁজি আবার গুণে গেঁথে বোঝা গেল টেনে চললে সামলানো যাবে।

তল্পি-তল্পা গুটিয়ে স্টকহোম থেকে বাবা মা ও মেয়ে বেরিয়ে পড়লাম সুন্দরী তরুণী হেলসিনকির দিকে।

তরুণী হেলসিনকি লিখলাম কেন না সে সুন্দরী ত বটেই এবং তরুণীও।

এই ত সেদিন সে ইতিহাসের পাতায় জন্ম নিল।

সেখানে গেলেই সেটা খুব বোঝা যায়। অল্প বয়সের চঞ্চলতা দুঃখকে জয় করবার শক্তি আর সামনে সূর্যোদয়ের দিকে চোখ, অস্তের দিকে নয়। এক কথায় চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

রাজা গুস্তাভ ভাজার খামখেয়ালীর জন্য হয় তার জন্ম।

সুইডেনের রাজা তখন এখানকারও রাজা। উনি হুকুম দিলেন ফিনল্যাণ্ডের চারটি শহরের লোকদের নিজেদের শহর ছেড়ে এইখানে থাকতে ও এই জায়গাটাকে গড়ে তুলতে।

এইখান থেকে বাণিজ্য ভাল হবে এবং জার্মান হান্সিয়াটিক লীগের শক্তি খর্ব করতে পারা যাবে।

একবার আগুনে পুড়ে ও একবার প্লেগের জন্য আর যুদ্ধে এই শহরের উন্নতিতে বাধা পড়ে।

যখন ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার একটি স্বাধীন করদ রাজ্য হয় এবং রাশিয়ার জার টুর্কুকে বেশী দূর মনে করলেন তখন হেলসিনকি রাজধানী হলো।

এদিকে হেলসিনকির দিকেই তখন দেবতার কৃপাদৃষ্টি। এমনি কাণ্ড টুর্কুতে বিরাট অগ্নিকাণ্ড হোল। ওখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে সরিয়ে আনতে হয়। সেই থেকে হেলসিনকি ফিনল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ও কালচারের মধ্যমণি হয়ে ওঠে।

এমনি জোর কপাল হেলসিনকির যে এর কিছুদিন বাদেই আগুন লেগে যা পুরনো পচা ময়লা সব জ্বলেপুড়ে গেল। আগুনের স্পর্শ তাকে অতীতের কলঙ্কমুক্ত করে গেল।

তখন তরুণী হেলসিনকি নতুন রূপে নতুন সাজে ঝলমল করে উঠল।

স্বনামধন্য স্থপতি কার্ল লুডভিক এঙ্গেল একে একটু একটু করে রূপে রঙে সাজাতে বসলেন। তাঁর এই চেষ্টা সার্থক হয়েছিল। তাই আজ হেলসিনকি রূপসী তরুণী। রূপের যেন তার শেষ নেই।

আমরা এখানে এসেছিলাম টুরিস্ট সিজিনের একটু পরে। থাকার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। টুরিস্ট অফিসের মেয়েটি বলল, হোটেলে ঘর পাওয়া ত মুশকিল, লোকে-লোকারণ্য। আমরা তো আকাশ থেকে পড়লাম। এখন ত লোক এত হবার কথা নয়।

সে বলল, এখানকার সরকার ভাল সময়টা রেখেছে দেশের বাইরের লোকদের জন্য। আর শীতের ছয় মাস ফিনল্যাণ্ডের লোকেরা হেলসিনকিতে আসে। সেই সময় যত সব সরকারী সভাসমিতি, কনফারেন্স ইত্যাদি হয়।

এইরকম বুদ্ধি করাতে রাজধানী সবসময় জমজমাট। হোটেল ইত্যাদি কিছুই খালি পড়ে থাকে না।

এই বুদ্ধিটা কিন্তু আমার খুব মনে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের ব্যবস্থা ভালই করে দিল।

সুন্দর ইংরেজী বলে মেয়েটি। ব্যবহারও তেমনি ভাল।

আমরা প্রায় সন্ধ্যাবেলা এসে পৌছেছিলাম। হোটেলে জিনিস

রেখে একটা পছন্দসই রেস্টুরেণ্ট দেখে রাতের খাওয়া সারা গেল। টনটনে ঠাণ্ডায় যাকে বলে চনচনে খিদে।

স্টেশন একটি দেখবার জিনিস।

আমরা ঠিক করলাম আজকের মত স্টেশনটি দেখে হোটেলে ফিরে আসব। এই রেলওয়ে স্টেশন বানিয়েছিলেন পৃথিবীর বিখ্যাত স্থপতি সারিনেন।

সারিনেন শেষ জীবনে গত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকান নাগরিক হয়েছিলেন।

কিন্তু নিজের দেশকে মনেপ্রাণে কি রকম ভালবাসতেন সেই কথা মনে হলে চোখে জল আসে। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ যেন তাঁর দেশে কবর দেওয়া হয়। উনি যখন ১৯৫০ সালে মারা যান তখন তাঁর নিজের বাড়ির বাগানে তাঁর দেহভস্ম প্লেনে করে এনে সমাধিস্থ করা হয়।

যুদ্ধ সকলের জীবনের উপর কত বড় একটা দুঃখের ছাপ ফেলে যায় তা কেন যে মানুষ বোঝে না, জানি না।

যারা মারা গেল তারা তো গেলই। যারা বন্দী বা অত্যাচারিত হোল যাদের আপনজন চলে গেল, তাদের দুঃখের ত কোন পরিসীমা নেই

যাদের জননী জন্মভূমি ছেড়ে যেতে হোল, এমনকি চোখ বোজবার আগেও ফিরে আসতে পারল না, তাদের দুঃখ কি অপরিসীম।

এখানকার সবচাইতে বড় ও উঁচু হোটেল হচ্ছে টনি। এর উপর থেকে এই শহরের বেশ ভাল একটা ধারণা হয়ে যায়।

এখানে বসে কফির পেয়ালাতে চুমুক দিতে দিতে পাশের টেবিলের একটি মেয়ের সঙ্গে গায়ে পড়েই কথা আরম্ভ করলাম।

'তোমাদের এই শহর সত্যিই বড় সুন্দর প্ল্যান করা। সবচাইতে চোখকে তৃপ্তি দেবার জায়গা হচ্ছে এই বিশেষ স্পটটি।'

'ঠিক বলেছ, তোমরা ত বিদেশ থেকে এসেছ। তোমাদের ত একথা মনে হবেই। আমরা যে ফিনল্যাণ্ডবাসী, আসি রাজধানীতে বলতে

গেছে প্রতি বৎসর। প্রথমই তাও এসে বসি এই টেবিলে। এখান থেকে নিজের দেশের রাজধানীকে দেখেও যেন আশ মেটে না :— মেয়েটি বলল।

'আমি এখানকার বাসিন্দা হলে বোধহয় আমারও সেই ইচ্ছে হোত।

'তোমরা কোথা থেকে আসছ?'

'ইণ্ডিয়া মানে ভারত থেকে।'

'আমি একটি স্কুলে পড়াই। জানলে তোমার খুব ভাল লাগবে, তোমাদের দেশের মেয়েরা আমাদেরও খুব গর্বের।

'তাই নাকি?'

'কেন জান? সারা বিশ্বে এই বিংশ শতাব্দীতে আর কোথাও মেয়েরা এত অল্প সময়ের মধ্যে এত এগিয়ে যেতে পারেনি। শক্তিশালী দেশের অধিবাসীরা মেয়েদের স্বাধীনতার সম্বন্ধে যতই চেঁচাক না কেন। এতেই তোমরা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছ তোমরা অতীতে সকলের অগ্রণী ছিলে। তখন ছেলে-মেয়েতে কোন তফাত ছিল না, কোন ক্ষেত্রেই। বিশ্বের মেয়েদের কাছে এটা কত গৌরবের বিষয়।'

মেয়েটির কথা শুনতে শুনতে আনন্দে গর্বে বুকটা উঁচু হয়ে উঠল। মনে হোল পিছিয়ে পড়ে থেকেও আমরা কোন কিছুতেই কম নই। এ ত আমাদের প্রথম সোপান।

প্রথমেই চোখে পড়ে স্টেশন ও চার্চ। এই দুটি একেবারে শহরের মাঝখানে। তাছাড়া আছে পার্লামেণ্ট ও স্টেডিয়াম টাওয়ার। এই বিরাট চার্চটিও লুর্ডভিকের তৈরি।

সম্পূর্ণ ইউরোপিয়ান স্টাইলের স্থাপত্য।

এখানেই মারশাল ব্যারন কার্ল গুস্টাভ ম্যানারহাইমকে সমাধি দেওয়া হয়।

এঁরই নেতৃত্বে ফিনরা গত মহাযুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল ও মান রাখতে পেরেছিল।

ম্যানারহাইম মারা যান সুইজারল্যাণ্ডে। সেখান থেকে তাঁর দেহকে প্লেনে করে নিয়ে এসে এই মহাচার্চে তিন-রাত তিন-দিন রাখা হয়।

হাজার হাজার দেশবাসী সজল চোখে তাঁকে শেষ প্রণাম জানায়।

ফিনল্যাণ্ডের ইতিহাসে এইরকম দেশাত্মবোধের দৃষ্টান্ত কমই আছে। এইসব কথা মেয়েটার কাছে শুনতে শুনতে মনটা ফিরে যাচ্ছিল নিজের দেশের সেইসব অগ্নিযুগে।

এখানকার হাউস অব পার্লামেন্টের স্থাপত্য দেখবার মত।

এটা লাল গ্রানাইটে তৈরি। এর চারদিকে এত সুন্দর ও বিরাট বাগান যে এটাও পার্লামেন্টের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে।

হঠাৎ মনের কোণে উঁকি দিল মাউন্ট আবুর বিখ্যাত জৈন মন্দির। কত বড় দুর্ভাগা ভারতবর্ষ, এই অপূর্ব মন্দিরের চারদিকটা সুনিপুণভাবে রাখতে পারেনি।

এখানকার স্টেডিয়ামও দেখবার মত। বন্দরের ধারে হচ্ছে মার্কেট স্কোয়ার। ভোরবেলা খেয়েই চলে গেলাম সেখানে। ওটা আবার দুপুর একটার সময় বন্ধ হয়ে যায়। এখানে বসে এক রঙবেরঙের মেলা।

নানা রঙের নানা ঢং-এর ফুল নিয়ে বসে সেইরকমই নানা রঙের পোশাক পরা ফুলওয়ালীরা। মনে হোল যেন এক একটা কবিতার পাতা থেকে বেরিয়ে এখানে এসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রসিদ্ধ ছবি 'ফুলওয়ালীর' চিত্রশিল্পী গোইয়ার কথা মনে পড়ে। তার পাশে পাশে রয়েছে ফলওয়ালীরা। তাদের রঙের পসরা নিয়ে, স্ট্রবেরি, রাস্পবেরি বলুবেরি ইত্যাদি।

তারাও যেন বলতে চায় আমরাই বা কম কিসে। কোন দিকে তাকাই ঠিক করতে পারি না।

এখানে সদ্য ধরা মাছ, তখনও খাবি খাচ্ছে, পাওয়া যায়। ঢাকা দোকানে মাংস ও দুধের যাবতীয় বানানো জিনিস এবং দুধও পাওয়া যায়।

এই মার্কেট স্কোয়ারে 'হেভিস আমাণ্ডার' অপূর্ব মূর্তি আছে।

ইনি নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন। তাকে সারা ফিনল্যাণ্ডবাসী ভালবাসত। এখানে 'ওয়ালপুরগিস' উৎসবের সন্ধ্যায় ছাত্ররা সকলে তাকে সাদা টুপি পরিয়ে দেয় ও চারদিকে নেচে নেচে আনন্দ করে।

এখানকার টিভোলিপার্ক, জু নানা ধরনের মিউজিয়াম সবই চোখে পড়বার মত ও দেখবার মত।

যা আমাকে সব চাইতে মুগ্ধ করেছে তা হচ্ছে এই শহরের কোনখানে স্লাম মানে বস্তি বলে কিছু নেই।

আপনারা জানলে অবাক হবেন এই দেশের কারেলিয়া বলে একটা অঞ্চলকে গত মহাযুদ্ধের ফলে রাশিয়াকে দিয়ে দিতে হয়।

এরা অবশ্য বেশীর ভাগই চাষ-আবাদ করার লোক, এক কথায় চাষী। তাদের সারা দেশময় এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

তার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৭০০০০০, তারা সকলেই সেই দেশ ছেড়ে ফিনল্যাণ্ডে চলে আসে।

হেলসিনকি শহরের লোক সংখ্যা কুড়ি পারসেণ্ট বাড়া সত্ত্বেও তা মোটেই বোঝা যায়নি এত সুন্দরভাবে ওরা ব্যবস্থা করেছে।

মানুষকে—সে যে দেশের, যে কালের যে অবস্থারই হোক না কেন, তাকে শেষ যাত্রা করতে হবে। তা ঠেকাবার সাধ্য কারও নেই।

সেইখানে রাজা ফকির সব এক। যমের দুয়োরে কাঁটা কেউ দিতে পারে না। এই শাশ্বত সত্যটা এখানকার অধিবাসীরা যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে।

দেখলাম এখানকার সমাধিক্ষেত্র এত সুন্দরভাবে রাখা। লোকেরা ছুটির সময়টা এখানে কাটায়। আমরা কলকাতাতে যেমন নদীর ধারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বা লেকের ধারে যাই।

দিল্লীতে অবশ্য রাজঘাট, শান্তিবন, বিজয়ঘাট সেই ধরনের।

সকলকেই অহরহ মনে করিয়ে দিচ্ছে অত বড়, অত মহান যে তাকেও একসময় মাটির কোলে ফিরে যেতে হবে। সেই সত্যকে যেন আমরা না ভুলে যাই।

এখানকার বিকিকিনির ব্যবস্থা একটা অপরূপ ব্যাপার। সারা ইউরোপে তা আছে কিনা জানি না।

বিরাট স্টেশনের মাটির নিচে স্তরে স্তরে এরা বানিয়েছে ছোটখাট

শহর। একতলা, দোতলা, তিনতলা, চারতলা। এস্কালেটারে অর্থাৎ গড়ান সিঁড়িতে শুধু দাঁড়িয়ে থেকে তুমি নেমে যাও, আবার উঠে এসো।

এই চারতলা শহরে কি নেই? পৃথিবীর সবকিছু তুমি পাবে। পৃথিবীর সব কিছু—হরেক রকমের জিনিস নানাভাবে সাজান। তাছাড়া আছে সিনেমা থিয়েটার রেস্টুরেন্ট।

মনে হোল লণ্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রীট, পিকাডিলী সার্কাস ইত্যাদি সব একসঙ্গে করে আরও সুন্দর ঝলমলে ও মন-মাতানোভাবে রাখা আছে।

ঢুকেই মনে হোল কোথায় এলাম? এ কে? মনে হোল এই দিক দিয়ে এখানেই সব চাওয়ার শেষ।

এইখানেই একটি রেস্তোরাঁতে খেয়ে নেওয়া হোল। কি যে খেয়েছিলাম কিছু মনে নেই। তবেই বুঝতে পারছেন এই কেনা-বেচার জায়গাটি মনকে কতটা কেড়ে নিয়েছিল।

আমার মনে হোল এত সুন্দরভাবে কেউ কি পার্থিব জিনিস রাখতে পারে যা দেখে অপার্থিবের স্পর্শ এসে মনের দ্বারে আঘাত করে?

দেখুন না, একটা আসল কথাই লিখতে ভুলে গেছি। মাটির নিচের চারতলা শহর রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত খোলা থাকে।

আমরা এখানে রাত বারোটা পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি। তখনও লোকে লোকারণ্য। মনে হয় যেন সারা পৃথিবী এসে এখানে ভেঙে পড়েছে।

হেলসিনকি থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ফিনল্যাণ্ডের সবচাইতে পুরোন শহর পরভু দেখতে।

বাসের কনডাক্টার ছেলেটি কি সুন্দরভাবে যে প্ররভুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল তা কোনদিন ভুলব না।

তাই ত আজকে তারই কাছ থেকে ধার করা বিদ্যা সবাইকে দিচ্ছি। 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে'

এখান থেকে এদেশের অনেক কবি ও চিত্রশিল্পী বেরিয়েছেন।

ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় কবি রুনেবার্গের জন্ম এখানে। এখনও তাঁর বাড়ি এত সুন্দরভাবে রাখা হয়েছে।

এখানকার ক্যাথিড্রেলে রুনেবার্গ ও রাশিয়ার জার প্রথম অ্যালেকজাণ্ডারের ব্রোঞ্জের মূর্তি আছে।

এইখান থেকেই হেলসিনকিতে ফিরে আসি। পরের দিনের যাত্রা শুরু হোল ফিনল্যাণ্ডের পুরোন শহর টুরকুর দিকে।

এই শহরটি অরা নদীর পারে। হেলসিনকি রাজধানী হবার আগে এই শহরই রাজধানী ছিল। এখন এটা ফিনল্যাণ্ডের তৃতীয় বড় জায়গা।

একে বলা হয় ফিনিশ কালচারের জন্মস্থান। শীতের সময় ফিনল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ সমুদ্রের জল জমে যায়। তাই বন্দরগুলোও অকেজো হয়ে পড়ে।

টুরকুর বন্দর এর ব্যতিক্রম। তাছাড়া টুরকু পশ্চিম দেশগুলোর সবচাইতে কাছে। এই দুই কারণে এই বন্দর প্রসিদ্ধ।

এখানকার একটি ব্যাপার মনে দাগ কেটে গেছে। ব্যক্তিগত দানের ওপর এখানে দুটি ইউনিভারসিটি চলছে। একটি ফিনিশ ভাষাভাষীর জন্য আর একটি সুইডিশ ভাষাভাষীর জন্য

১৮২৭-এর বড় অগ্নিকাণ্ডের পর এই শহর খুব সুন্দর পরিকল্পনায় গড়ে ওঠে। বড় বড় পার্ক, সোজা চওড়া রাস্তা, উঁচু উঁচু সুন্দর বাড়ি। শহরের ভেতরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো কি সুন্দরভাবে সাজান।

সেই অতীতের বীভৎস অগ্নিকাণ্ড থেকে যে দিকটা বেঁচেছিল তা এত সযত্নে রেখেছে যে সেই যুগের এই দেশের সবকিছু বেশ জানা যায়।

দেড় লাখ লোকের শহরটি সংস্কৃতি ও বাণিজ্য এই দুই দিকেই খুব উন্নত।

এখানে প্রতি বৎসর ষাট লাখ বিদেশী আসে। এই বন্দর দিয়ে নব্বই হাজার মোটর ও বাস পারাপার করে।

টুরকুর দুর্গ একটি দ্রষ্টব্য। প্রথম এটা বানানো হয় সৈন্যদের জন্য। শহরের নিরাপত্তার জন্য। এর দোতলার ব্যানকোয়েট হল স্ক্যানডেনেভিয়ার মধ্যে সবচাইতে সুন্দর ও ঝলমলে করে সাজানো।

॥ নয় ॥

কোচে করে ফিনল্যাণ্ডের মাঝখানের দিকে যেতে যেতে কবির এই কটি লাইন মনের মাঝে ঝংকৃত হচ্ছিল—

'বিশ্ব বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা
নিত্য নৃত্যরত সভঙ্গিমা।'

প্রকৃতি কি সাজে সেজেছে, হাজার হাজার হৃদয়ের সঙ্গীত, বাতাসের গান, পাতার মর্মর ধ্বনি, বড় বড় গাছের ডালের শনশন শব্দ মিলিয়ে যেন এক নতুন সুর ঝংকৃত হচ্ছে 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু।'

এইখানে এলে মনে হয় চঞ্চলা প্রকৃতি সব বাঁধন মুক্ত। মানুষ তাকে সোনার অতি হাল্কা শেকলও পরাতে পারেনি। এইখানে মানুষ ছোট শিশুর মত। কোন রকমে প্রকৃতির কোলে এখানে সেখানে ঠাঁই নিয়েছে।

ফিনল্যাণ্ডের ষাট হাজার হ্রদের বেশীর ভাগই এই দেশের মাঝখানে। বাকি সবই বন। তার ফাঁকে ফাঁকে মানুষ বসতি করেছে। ঘর বানিয়েছে খুবই শক্তভাবে। তাও মনে হয় এখানে মানুষের উপর প্রকৃতির কর্তৃত্ব—তাই এখনও ফিনল্যাণ্ডকে মনে হয় সৃষ্টিছাড়া।

যা দেখতে আমরা ইউরোপে অভ্যস্ত এ দেশ যেন তা নয়। এই রকমটি যেন কোথাও দেখিনি। ইউরোপের মধ্যে এটা সত্যিই আর সকলের চাইতে আলাদা।

হোটেল আলবাকো বিরাট ও সুন্দর এবং খুব আধুনিক। এখানে থেকে, ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু দেখা গেল। অনেক পুরোন পুরোন চার্চ ও দুর্গ। এর ভেতরের কাঠের উপর খোদাই করা সব ছবি দেখলে বেশ

বোঝা যায়, সে যুগের এই দেশের লোকেরা নরকের কষ্টের কথা বিশ্বাস করত।

ফিনল্যাণ্ডের ম্যানচেস্টার হচ্ছে টামপেরে নামে একটি জায়গা। এটা হচ্ছে ফিনল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বড় শহর। এখানে বাস করে ১২৬,০০০ লোক। এখানে অনেক কলকারখানা আছে।

বহু বছর আগে এখান থেকেই ব্যবসায়ীরা ও শিকারীরা উত্তরদিকে যেত, এমন কি ল্যাপদের দেশেও।

১৭০৯তে এক সুইডিশ রাজা এই জায়গাটিকে আবিষ্কার করেন। তারও একচল্লিশ বৎসর পর জেমস ফিনলেসন নামে একজন স্কটল্যাণ্ডের লোক এই শিশু দেশটিতে আসে।

এখানে প্রথম কাপড় বানাবার ফ্যাকট্রি সেই তৈরি করে। ফিনল্যাণ্ডের বোধ হয় এইটাই প্রথম বড় ব্যবসা আরম্ভ হয়। এখনও ফিনলেসন ফার্ম নামে বিরাট ইনডাস্ট্রি চলছে।

এখানে চারশ ফ্যাক্টরী আছে। এত সুন্দরভাবে ফ্যাক্টরী সব তৈরি হয়েছে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতটুকু নষ্ট হয়নি।

একটু এগিয়ে গেলেই বিরাট বন্দর। তার আশেপাশে ছুটি কাটাবার ভারী সুন্দর ছোট ছোট কুটির বা ক্যাম্প বানানো আছে।

আবার বোধ হয় একই কথা বলতে ইচ্ছা করে যে এখানকার মানে স্ক্যানডিনেভিয়ার লোকেরা যা পেয়েছে সেটাই যথেষ্ট। তাই মাথায় করে নিয়ে তারা তাকে এমনভাবে আদরে যত্নে ব্যবহার করেছে বা করছে যে লক্ষ্মী ওখানে যেন ক্রমশ অচঞ্চলা হয়ে পড়ছেন।

হোটেলে বসে বসেও অনেক খবর সংগ্রহ করেছি। যেমন লাহ্‌টিতে না গিয়েও যা জেনেছি লিখলাম। টামপেরেতে গিয়ে অবশ্য চোখ সার্থক করেছি। এদেশের ইতিহাস শুনেছি প্রচুর, অবশ্য সত্যি কথা বলতে কি ভুলেছিও প্রচুর।

লাহ্‌টি নামে শহরটি উইনটার স্পোর্টস-এর জন্য বিখ্যাত। এইখানেই পৃথিবীবিখ্যাত স্কী চ্যাম্পিয়ানশিপ হয়।

হেলসিনকিতে ফিরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল মানুষের পূর্ব-

পুরুষরা যে যাযাবর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন মানুষ সমাজ সংসারের মধ্যে বাস করে। তাও মাটির টানে টানে বেরিয়ে পড়ে অজানার সন্ধানে, সুদূরের দিকে।

মনের মধ্যে জেগে ওঠে সেই আদিম চঞ্চলতা।

আবার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে ঘরের টানে ঘরে ফিরে আসে। এই টানাপোড়েনের ভিতর দিয়েই চলেছে মানুষের জীবন।

আমরা হেলসিনকিতে ফিরে এসে, ফিনল্যাণ্ডের ল্যাপল্যাণ্ডে যাবার জন্য তোড়জোড় করছি, রাস্তায় দেখা হয়ে গেল এক ফিন বন্ধুর সঙ্গে। দিল্লীতে সুইডিশ এমব্যাসীর একজন অফিসার।

তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর কাছে এই দেশের অনেক কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনতাম। যাওয়া ত হবে না কোনদিন। জেনেই সুখ। তারপর তারা ওখান থেকে বদলী হয়ে যায়। কত বৎসরের কথা। নামও তাদের প্রায় ভুলতে বসেছিলাম।

হঠাৎ রাস্তায় দেখা। চেনা চেনা চেহারা দেখে ও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রাস্তার মাঝখানে আমরাও।

'কি আশ্চর্য! তুমি এখানে? আমাদেরও ত একই প্রশ্ন!'

'বাঃ, ভাল কথা বলেছ। এটা ত আমার দেশ।'

সত্যি কথা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম, ও যে এদেশের লোক। তাই কথার মোড় দিলাম ঘুরিয়ে।

'তোমার স্ত্রী?'

'উনি বছরখানেক হোল মারা গেছেন।'

'আহা, তাই নাকি?'

'আমি এখন একা। ছেলেমেয়েরা এদিক-সেদিক। তাই হয়। তোমাদেরও বলে রাখলাম। বয়স বাড়লে দেখা যায় জীবন আরম্ভ হয় দুজনকে দিয়ে আর কপাল ভাল হলে সেই দুজনেই গিয়ে ঠেকে। আমার অবস্থাও হয় অর্ধেকের।'

আবহাওয়াটা যেন কেমন হয়ে উঠেছিল। সবাই জানে ভবিতব্য কেন বাধ্যতে। তবুও সবাই চায় যতদিন সম্ভব তা এড়িয়ে যেতে।

'রাস্তায় দাঁড়িয়েই কি আমাদের শুরু ও শেষ হবে না কি ?'

'সে কি কথা ? উঠেছি হোটেল টর্নিতে। চল সেখানে।'

হোটেলে গিয়ে আমাদের প্ল্যানের কথা বললাম। শুনে ত ভদ্রলোক একেবারে লাফিয়ে উঠল।

'চল, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। আমার দেখা, তাতে কি ? আবার দেখব। কদিন ছুটি বাড়িয়ে নেব।'

'তুমি ছুটিতে আছ ?'

'রিটায়ার করে আবার কাজ নিয়েছি কোপেনহেগেনে'

'কি বলছো ? আমরা ত ওখানে গিয়েছিলাম। দেখা হয়নি ত ?'

'সত্যিই ?'

'সে কথা ভাববার কোন মানে হয় ?' উনি বললেন।

'ঠিক বলেছ। এখনও ত না হতে পারত।' ভদ্রলোক হেসে বলে উঠলেন।

মেয়ে ফোড়ন কাটল। পরের দিন চারজনে যাবার সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

ফিনল্যাণ্ডের ল্যাপল্যাণ্ড।

ভাবতেই মনটা কেমন করে ওঠে। যখনই এই বরফে ঢাকা দেশের কথা ভেবেছি হাজার হাজার মাইল দূরে বসেও যেন হিমেল হাওয়ার স্পর্শে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

মনে হয়েছে সেই দেশ কখনও আমাদের মত লোকের জন্য নয়।

চিন্তার মধ্যে যেন দেখেছি অন্ধকারে হিমগিরির আড়ালে অশ্রুমুখী জগৎজননীর দুঃখিনী কন্যা। শুভ্র শাড়ীতে আবৃতা অবগুণ্ঠনবতী, নিস্পন্দ প্রাণহীনা।

দুঃখের পসরা ছাড়া বুঝি আর ওর কোন কিছুই নেই, থাকতে পারে না।

যখন সে ঘোমটা খুলে দাঁড়াল, তখন সকলে দেখল মার সে ছোট মেয়ে হতে পারে, অন্য ধরনের রূপ তার হতে পারে, কিন্তু তার বিশেষ ধরনের রূপে সে অনিন্দিতা।

হেলসিনকি থেকে ট্রেনে উনিশ ঘণ্টায় রোভেনিয়েমিতে পৌঁছান যায়। রোভেনিয়েমি হচ্ছে ল্যাপল্যাণ্ডের রাজধানী।

চড়ে ত বসলাম ট্রেনে চারজনে। অনেক ঘণ্টা একসঙ্গে থাকা হবে। ঘুমটাকে দেওয়া হোল যতটা সম্ভব কাট-ছাঁট করে।

ফিন বন্ধু বললেন, 'এসেছ আমাদের দেশে, কতদূর থেকে, যতটা পার সব জেনে যাও। দেশে গিয়ে সবাইকে বলতে পারবে আর আমার কথা মনে পড়বে।'

'তোমার কথা আগেও মনে ছিল, এখন তো আরও মনে থাকবে।'

'আমারও মনে আনন্দ হবে বিদেশী বন্ধুদের যত করে সব বলতে পেরেছি ও দেখাতে পেরেছি। জীবনে এইসব ঘটনাই ত চিরদিন মনে থেকে যায়।'

'খুব ঠিক কথা বলেছ।'

'ঘুমটাকে তবে একেবারেই কাট করে দেওয়া যাক, কি বল?'

বন্ধু বলতে আরম্ভ করলেন, 'আগে এই দেশে আসা মানে আসা ছিল না, অভিযান ছিল। দেশ বেড়ান ছিল না, দেশ আবিষ্কার ছিল।'

'কি সুন্দরভাবে তুমি বলছ।'

'শোন তবে, সেই সময় ক্যানাডার পেটসামো নিকেল কোম্পানি নামে এক কোম্পানি বিরাট রাস্তা তৈরি করল। সেটা রোভেনিয়েমিকে আর্কটিক সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করল। এটার পরে নাম হোল আর্কটিক হাইওয়ে।'

'ভাগ্যিস কোম্পানি রাস্তাটা তৈরি করেছিল।

'রাস্তা ত তৈরি হোলই, এমন কি কিছু হোটেলও তৈরি হোল আগন্তুকদের জন্য। এখন এই কোম্পানি রাশিয়ার হাতে। গত মহাযুদ্ধে জার্মানরা এই সুন্দর রাজধানীটিকে বলতে গেলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক ফিনরা প্রত্যেকটি জার্মানকে তাড়িয়ে দেয়।'

'সত্যিই।'

'জান, আমাদের দেশবাসীর কথা ভাবলে গর্বে বুক ভরে যায়। ওরা

দুঃখের কথা ভুলে চোখের জল মুছে সেই ভস্মীভূত জায়গাটা নতুন করে বানাবার জন্য সব উদ্যম দিয়ে লেগে যায়।'

'জান, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তখনকার ফিনদের মনে বেজে উঠেছিল সেই চিরকালের স্বর. 'সত্যমেব জয়তে।'

মনে হচ্ছে নিজের ছোট্ট পশ্চিম বাংলার কথা। পার্টিশন ঠিক এইভাবেই আমাদের ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। আমরা কেন এত বৎসরেও নিজের দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারিনি?

শুধু এই প্রশ্নই মনকে মথিত করে দিচ্ছে। আমরা দেশটাকে যেন তেমনভাবে ভালবাসি না। না হলে নিশ্চয়ই পারতাম।

ও তখন আরও কত কিছু বলে চলেছে। মন আমার কিন্তু চলে গেছে কবি কালিদাসের যুগে। তার সম্বন্ধে সেই গল্পটা মনে পড়ছে।

তখন উনি কবি হননি। কিংবদন্তী আছে তিনি তখন বুদ্ধিহীন ছিলেন। সেই সময় একদিন যে ডালটিতে বসে ছিলেন সেটাই কাটছিলেন।

আমাদের বুদ্ধি যেন অনেকটা কিংবদন্তীর গল্পের কালিদাসের মত। যে মাটিটার উপর স্থান পেয়েছি সেটাকেই হয় অবহেলা করছি, না হলে হা-হুতাশ করছি।

'চল, সবাই খেতে যাওয়া যাক। সময় হোল আর তোমারও একটু বিশ্রাম দরকার মুখের।' উনি বললেন।—সবাই উঠে পড়া গেল। খেতে খেতে নানা গল্প হচ্ছিল। হাল্কা মেজাজের আনন্দের খুশীর।

'দশ বৎসরের মধ্যে ওরা এই রাজধানীকে এমন করে গড়ে তোলে যে এটা যে ভেঙে গিয়েছিল তার কোন চিহ্নই আর ছিল না। এমনকি ১৯৪৪ এর আগে যা ছিল তার চাইতেও সুন্দরভাবে'

'জান, দুটি তিনটি শহর রাশিয়ানদের দিয়ে দিতে হয়েছে। ঐসব শহরের অধিবাসীরা তাদের দেশ ছেড়ে ল্যাপল্যাণ্ডের অন্য দিকে চলে আসে।'

আমরা ত এসে পৌঁছলাম ল্যাপল্যাণ্ডের রাজধানী রোভেনিয়ামিতে। সঙ্গের ভদ্রলোক তো সব জানে। নিয়ে গেল একটি জুতসই

হোটেলে। এখানে একদিন থেকে আমরা খুব ঘোরাঘুরি করলাম।

অদ্ভুত এক অনুভূতিতে মন গিয়েছিল ভরে। রাতটা হয়ে আছে দিন। দিনটাও অবশ্য দিনই। আমাদের দেশের মত দিনের আলো নয়। তা হয় না এমনিতেই।

তাই আমরা রাতটাকেও দিনের কাজে লাগাতে পেরেছিলাম। টুরিস্টদের এটা খুব সুবিধে। বলতে গেলে একদিনে দুদিনের কাজ হয়ে যায়।

ওখানকার অধিবাসীরা অবশ্য তা করে না। দিন রাত ওরা ঘড়ি ধরে ঠিক করে নিয়েছে।

উইন্টার স্পোর্টসের জন্য এখানে সারা বিশ্বের লোক আসে জানুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে আর মে থেকে জুলাই-এর মধ্যে। তখন এ জায়গাকে বলা হয় মধ্যরাতের সূর্যালোকের দেশ। এই সময় এখানে সূর্য কখনও ডোবে না। তাই সারা রাত সকলে ঘুরে বেড়ায় স্কী করে। এই সময় এখানকার অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব পোশাক পরে বল্গা-হরিণ নিয়ে এদেশ থেকে ওদেশে যায়। দেখবার জিনিস।

এই দৃশ্য দেখবার জন্য অনেকে আসে আমরাও দেখলাম।

আর একটু এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে লেক ইনরি, সোনার লেক। আমরা অবশ্য সেখানে যাইনি। সোনার লেক মানে শুধু স্বর্ণের হ্রদ তা নয়, জলেরই হ্রদ। তবে তার নিচে সোনার টুকরো সব রয়েছে। আর আছে স্বর্ণনদী।

জল ছেঁকে ছেঁকে লোকেরা তাই বের করছে। এতেই এই দেশের সব চাইতে বড় আয়। আরও একটি নদী আছে, নাম লেমেনযোকি। লেমেনযোকি কথাটার মানে হচ্ছে ভালবাসা।

সত্যি কথা বলতে সব নদী চিরকাল ধরে মানুষের মনে সোনার নদী বলেই আদরের। এই নদীর জলই ত বিশ্বের মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই নদীকে প্রাণও বলা হয়।

গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনতে কত সহস্র বৎসরের তপস্যা করতে হয়েছিল।

এই নদী একদিকে যেমন জননীর মত মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে, আবার অন্য দিকে মৃত্যুস্নানে শুচিস্নাতা করে দিচ্ছে।

বলতে গেলে কয়েক বৎসর আগে ফিনল্যাণ্ড ইউরোপের কাছে অজানা অনাদৃত উপেক্ষিত ছিল।

কেউই বড় একটা বাইরে থেকে সেখানে যাবার কথা ভাবত না বা যাবার মানেই খুঁজে পেত না।

ফিনল্যাণ্ড ছিল কবির কাব্যের উপেক্ষিতা উর্মিলার মত। যদিও ইউরোপের মধ্যে, তবুও তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি। আজ সে সবার মাঝে একজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর সকলের তুলনায় সে যত ছোটই হোক, যত সামান্যই হোক।

সেটা শুধু সম্ভব হয়েছে তাদের অসীম সাহস, অদম্য এগিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষার জন্য।

আর ওদের দৃঢ় ধারণা, একমাত্র শ্রমই দেশকে এগিয়ে নিতে পারে এবং শ্রম গর্বের জিনিস।

গত মহাযুদ্ধে তাদের যা ক্ষতি হয়েছে তা সীমাহীন। সে সময়ে যুদ্ধ করতে পারত বা করেছে ও বেঁচে আছে যারা তাদের ষোল জনের মধ্যে একজন হচ্ছে পঙ্গু. সতের জন বিবাহিতাদের মধ্যে একজন করে বিধবা এবং যুদ্ধের সময়কার বাচ্চাদের মধ্যে চব্বিশজনের মধ্যে একজন অনাথ। এই অবস্থাটা তারা যুদ্ধের উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে।

এদের কথা ভাবতে ভাবতে সোনার চেয়েও দামী আমার আমিকে যেন ধীরে ধীরে ফিরে পাই।

সহস্র সহস্র মাইল দূরে পিছে ফেলে আসা সোনার পশ্চিম বাংলার দিকে মন ফিরে চলে যায়।

মনে আশার আলো জ্বলে ওঠে। কত ত্যাগ দুঃখ কষ্ট যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করেছি। আবার আমরা বড় হব। লুপ্ত গৌরবকে ফিরিয়ে আনব।

॥ দশ ॥

লণ্ডনের রাস্তায় হঠাৎ আইসেনবার্গের সঙ্গে দেখা। দিল্লির বন্ধু : জার্মান জ্যু।

হিটলারের যুগের প্রথম দিকে মা-বাপ ইত্যাদি সকলের সঙ্গে আমেরিকাতে পালিয়ে যান। কপাল ভাল, এমন সময় পালিয়েছিলেন যখন গোলমালটা ঠিক জমাট বাঁধেনি।

তাই অনেক কাল থেকেই হয়ে গেছেন আমেরিকাবাসী, মানে আমেরিকান। কথায়বার্তায়, চালেচলনে এখন পুরোপুরি আমেরিকান। শুধু চেহারাতে ভদ্রলোকের জার্মান ভাব রয়ে গেছে। মানে শক্তসমর্থ চওড়া চেহারা, জার্মানরা যে রকম হয়ে থাকে। স্ত্রীটিও জার্মান, কিন্তু ছোটখাটো।

যাই হোক স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব দিলখোলা ভাল লোক। বিশেষ করে আমাদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল।

ভদ্রলোক ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ইণ্ডিয়া বেস-এর সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ড ছিলেন।

লণ্ডনে হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে মনটা সত্যি আনন্দে ভরে গেল। মনে হোল বিদেশে দেশের লোক পেয়ে গেলাম।

'কি ব্যাপার ? তুমি কোথা থেকে ?'

'কেন, আমরা কি আসতে পারি না ?'

'সে কি, মিসেসও সঙ্গে নাকি ?'

'আলবৎ, হঠাৎ ছুটি পেয়ে গেলাম। আনএক্সপেক্টেড্। জানই তো, বড় ছেলে আছে ইজরাইলে। মেয়েকে নিয়ে দুজনে সোজা সেখানে গিয়েছিলাম। ওখানে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছি। এখানে কয়েকদিন থেকে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট হয়ে ওয়াশিংটন যাব।'

বললাম, 'ফ্র্যাঙ্কফোর্ট কেন ?'

'জন্মেছিলাম যেখানে, যেখানে ছোটবেলায় অনেকটা সময় কেটেছে, তার মায়া কি কাটে? যদিও আমাদের ওখানে এমন কিছু নেই, থাকি গিয়ে হোটেলে। তাও দেখ মনটা কত টানে। তোমরা ভাগ্যবান। নিজের দেশ আছে, নিজের দেশে থাক। শুধু তাই নয়, নিজের দেশে কত মানী হয়ে আছ।' কত বড় হয়ে আছ। এর চাইতে বড় ভাগ্য কি হতে পারে?'

হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল তাদের জন্য। এত ঐশ্বর্য এত কিছু রয়েছে তবুও মনের এক কোণে একটা কাঁটা খচখচ করে বিঁধছে।

আবার যেন মাথা নত হয়ে এল ভগবানের কাছে। সত্যিই তো তাঁর কত দয়া আমাদের উপর।

তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলাম। 'কি, রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা হবে নাকি?'

'আমি তো একাই ঘুরছিলাম। মিসেস তো সঙ্গে আসেনি। হোটেলে আছি।'

তখন ঠিক হোল পরের দিন ওরা আমাদের এখানে আসবে দুপুরে খেতে।

আস্তানায় গিয়ে মেয়েকে বললাম এদের কথা। অনু খুব খুশী। আঙ্কল, আনটির সঙ্গে দেখা হবে।

ঠিক হোল ক্লাস শেষ করেই ও বিকেলে চলে আসবে আমাদের কাছে। সবাই মিলে আড্ডা ও ডিনার হবে।

গল্পে গল্পে জার্মানীর কথা উঠল। দেখলাম দুজনেই ওই দেশের কথা বলতে ও শুনতে আগ্রহী। দুজনেই খুব গুণী লোক।

দিল্লিতে কত সন্ধ্যা ওদের সঙ্গে কাটিয়েছি আর বুঝেছি দুজনে আমাদের দেশের ইতিহাস, আর্ট, কালচার, ধর্ম সব বিষয়ে কত গভীর-ভাবে পড়াশুনা করেছে। কত কিছু জানে।

আমরা কজনই বা নিজের দেশের বিষয়ে আগ্রহী যে পরের দেশের কথা জানব?

দিল্লিতে ওরা আমাদের কাছে অনেক কিছু জানতে চেয়েছে বা আশা

করেছে জানতে পারবে বলে। আজ আমার পালা ওদের কাছে জার্মানীর কথা জানবার।

কয়েকদিন পরেই মেয়ের ছুটি হবে। ঠিক হয়ে আছে তখন আমরা যাব ফ্র্যাঙ্কফোর্টে। লাঞ্চের পর বিয়ারের মগ হাতে জমিয়ে বসা হোল।

'তোমরা তো দুজনেই ইতিহাস ভালবাস, প্রথমে ইতিহাস দিয়েই আরম্ভ করব।' বলল মিস্টার।

'বা রে, ওরা যেন আর্ট, কালচার ইত্যাদির ভক্ত নয়,' মিসেস প্রতিবাদে রিটর্ট করল। তার পরই বলল, 'তুমি ইতিহাস দিয়েই আরম্ভ কর। হিটলারের আগের কথা।'

আমিও বললাম, 'সেটাই ভাল হবে, আগের কথা জানলেও খুব জানি না।'

'এই দেশের প্রাণ হচ্ছে রাইন নদী, যেমন তোমাদের গঙ্গা। রাইন নদীর কথা না জানলে এই দেশকে বোঝা শক্ত। জার্মানীর আর এক নাম রাইনল্যাণ্ড। এই নদী সুইজারল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে 'ফাল্‌জ' অর্থাৎ দক্ষিণ অঞ্চলকে আরও দক্ষিণে রেখে পশ্চিমে সার এলাকাকে ফেলে ওয়র্মস, মেইন্‌জ, হেসে ও আরও অনেক নাম করা শহরের পাশ দিয়ে আপন মনে এগিয়ে চলেছে।

আপন মনে সে চলেই চলেছে। বোধ হয় কোন দিন ভাবেনি তাকে কেন্দ্র করেই এত বড় দেশ গড়ে উঠেছে, এত বড় জাতি হিসাবে গণ্য হয়েছে বিশ্বের মাঝে।

রোমানরা এই দেশের খবর পেয়ে গিয়েছিল অনেক শতাব্দী আগে। কত রকম ট্রাইবের লোক এখানে এসেছে, আবার চলেও গেছে তার কোন ঠিক নেই। কত শতাব্দী ধরে এই আসা-যাওয়ার পালা চলেছে। দু দিকই খোলা।

যুদ্ধ অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু এই নিয়মের পরিবর্তন হয়নি।

রোমানরা এসে এখানে জুত করে বসে তৈরি করল হোলী রোমান এম্পায়ার জার্মান নেশনের।

তারপর শুরু হোল রাজ্যের ভাঙা-গড়া। হতে হতে শেষে যা এখন

তাতে এসে ঠেকল। শেষ ভাঙন হোল হিটলারের হারের পরে – পুব ও পশ্চিম জার্মানী।'

ততক্ষণে মেয়ে এসে হাজির হোল।

'এ কি? সবাই মিলে কি গুরুগম্ভীর আলোচনা হচ্ছে? এতদিন পরে আন্টি, আঙ্কলের সঙ্গে দেখা। আমি সবার জন্য ভাল সিনেমার টিকিট কিনে এনেছি। চান্সে পেয়ে গেছি। গতকালই কিনে ফেলেছিলাম। থিয়েটারে নিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এত শর্ট নোটিসে তো আর তা হয় না।'

সবাই হৈহৈ করতে করতে বেরিয়ে পড়া গেল।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা দুজনে যখন ফিরছিলাম, মনে হোল আবার ওদের সঙ্গে কবে দেখা হবে জানি না। হবেই কি না তারই বা কি ঠিক আছে!

ক'দিন বাদে আমাদের ফ্র্যাঙ্কফোর্ট যাওয়া ঠিক হোল। মেয়ের ছুটি আরম্ভ হচ্ছে। এইবেলা জার্মানী ভাল করে দেখে আসব সেই প্ল্যান।

মেয়ে অবশ্য বারে বারেই বলেছে, 'আমার জন্য কেন তোমরা সময় নষ্ট করছ! তোমরা ঘুরে বেড়াও।'

বলেছি, 'মা হলে বুঝবি কেন বসে থাকি তোকে সঙ্গে নেবার জন্য। আরও বুঝবি যদি কম ছেলেমেয়ে হয়।'

যেদিন রওনা হব সেদিন রাতে আর দু চোখের পাতা এক করতে পারছিলাম না। বারে বারে মনে হচ্ছিল যে দেশে চলেছি সেই দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের কথা। এই দেশ থেকে যত বেরিয়েছে তত বোধ হয় আর কোন একটা দেশ থেকে বের হয়নি।

এরা যেন দেবতার বরপুত্র। জীবের কত উপকার করেছে আজকাল কি আমরা তা মনে করে রাখি বা ভাবি?

আজ আমরা সকলে কত সহজে সব রকম বই পড়তে পাই, যেটা আগে সম্ভব ছিল না। এটা হতে পেরেছে য়োহান গুটেন্‌বার্গের জন্য।

উনিই প্রথম পনের শতকে ছাপানো Printing আবিষ্কার করেন।

তার একশ বৎসরের মধ্যে ফিজিসিয়ান পারাসেলাস কেমিকেলী ওষুধ বানানো আবিষ্কার করেন।

ষোলশো তিরিশের মধ্যে কেপলার কেপলারের ল বের করেন। রবার্ট কক্ টিবি ও কলেরার বেসিলাই। রোয়েনট্জেন রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার করেন। আইনস্টাইনের কথা কে না জানে।

সকলের কথা লিখতে গেলে সকলের মনে হতে পারে, দূর ছাই, একগাদা বিজ্ঞানীদের নাম ও কাজের কথা কেন লিখছে, জাস্ট বোরিং।

ঠিকই। বিশেষ করে যখন যে সব জিনিস সহজলভ্য হয়ে যায় তখন মানুষ বড় অনায়াসে তা গ্রহণ করে। তা হয়ে ওঠে মূল্যহীন যদিও তা হতে পারত অমূল্য।

ফ্রাঙ্কফোর্ট এয়ার-পোর্ট হচ্ছে ইউরোপের মধ্যে সব চাইতে বড়। দু মাইল লম্বা রানওয়েতে এসে যখন আমাদের প্লেন থামল মনের মধ্যে কেমন করে উঠল।

মনে হোল এখন এরা যা করে নিজেদের এত বড় ও প্রতিষ্ঠিত মনে করছে—আমাদের তা ছিল হাজার হাজার বৎসর আগে।

রাম পুষ্পকরথে সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরেছিলেন। উঁচু থেকে যে বর্ণনা আমরা রামায়ণে পাই তা একমাত্র যারা অত উঁচু থেকে চলমান জিনিসে করে যায় তারাই শুধু তা লিখতে পারে বা বলতে পারে। তাই পৃথিবীতে যত দিন না প্লেন চালু হয়েছিল ততদিন সকলে ধরে নিয়েছিল মহাভারত রামায়ণ নিছক বানানো গল্প।

সেদিন কাগজে দেখলাম বড় বড় ঐতিহাসিকরা এখন এই সিদ্ধান্তেই আসছেন যে রামায়ণ মহাভারত তখনকার কালের ইতিহাস। মোটামুটি-ভাবে অন্তত।

এখন যেমন এরা আমাদের ডেভেল্যাপিং বলে নিচু চোখে দেখে, ঠিক সেই রকমই বোধ হয় তখনকার দিনে আমরা অন্যদের দেখতাম। কেননা তখন তাদের কিছুই ছিল না। তাই মনে হয়, "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে—দুঃখানি চ সুখানি চ।"

আস্তানায় জিনিস রেখে একটু ভাবতেই বসতে হোল—কি কি জিনিস দেখব ও কি ভাবে।

সত্যি কথা বলতে কি ফ্রাঙ্কফোর্টটা ঠিক টুরিস্টদের জায়গা নয়। এটা হচ্ছে ব্যবসার ক্ষেত্র। তাই যারা আসে, বেশীর ভাগই ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে। তাছাড়া যারা আসে তারা এটাকে Stop over হিসাবে ব্যবহার করে।

শেষপর্যন্ত ভেবেচিন্তে গেলাম সকালে ওল্ড টাউনে গেটের বাড়ি দেখতে। এই বাড়িতে মহাপুরুষ গোটে জন্মেছিলেন সতেরশো উনপঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দে।

উনি হচ্ছেন বিশ্ববরেণ্য। ওঁর লেখা কবিতা, নাটক এবং অটোবায়োগ্রাফী পৃথিবীবিখ্যাত। তাছাড়াও উনি ছিলেন উকিল। রাজনীতিজ্ঞ ও ন্যাচারাল সায়েন্স শাস্ত্রে পারদর্শী। গোটের লেখা ফাউস্টের নাম কে না জানে। উনি জন্মেছিলেন তখনকার দিনের এক অভিজাত পরিবারে। তাই তাঁর বাড়ি দেখে তখনকার দিনের অবস্থাপন্ন লোকের থাকার ধরনটা বেশ বোঝা যায়।

উনিশো সাতাশ থেকে গেটে পুরস্কার দেওয়া হত প্রতি বৎসর কোন বড় লেখক বা বৈজ্ঞানিককে। উনিশশো উনপঞ্চাশে টমাস ম্যান এই পুরস্কার পান।

তারপর থেকে তিন বৎসর অন্তর অন্তর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গও কিছু বৎসর থেকে নামী লোকদের নামে প্রতি বৎসর পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ করেছে। একটা কথা আছে না: "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে"।

পশ্চিমবঙ্গও বড় হবার আশা রাখে। আশা আর চেষ্টা, এই দুটিতে মানুষকে এগিয়ে নিতে পারে।

পুরনো শহরে আরও একটা দেখবার জিনিস আছে। তের শতকের গির্জা নিকোলাইকার্চ, যার গম্বুজটা দেখবার মত। নিচের দিকটা রোমান স্টাইলের। মাঝখানে গথিক স্টাইল আর ওপরটা হচ্ছে উনিশ শতকের স্থাপত্য। এরই কাছে রোমান বার্গ নামে একটা স্কোয়ার আছে।

সেইখানে সম্রাটদের রাজত্বকালে রাজ্যাভিষেকের সময় খুব আমোদ-আহ্লাদ হত।

তখনকার রীতি অনুসারে একটা গরুকে ঝলসিয়ে সেই মাংস খাওয়া হোত, আর তখন এর ফোয়ারা থেকে জল না বেরিয়ে বের হোত মদ। বুঝতেই পারছেন কি হল্লাটাই হোত!

এই পুরনো জায়গার নিউস্টাড্‌ট অর্থাৎ নতুন শহর নামটাই মনে হয় যেন কেমন বেখাপ্পা। কেননা এটার আরম্ভ হয় তেরশো তেত্রিশে। যাই হোক এই শহরের চারিদিকে ছিল উঁচু দেওয়াল আর পরিখা। এই শহরের রক্ষার্থে।

নেপোলিয়ান আঠারশো পাঁচ খ্রীষ্টাব্দে এই দেওয়াল চুরমার করে দেওয়ার জন্য হুকুম দেন। তবে অল্প একটু দেওয়াল না ভেঙে রাখা আছে। তাই থেকেই বোঝা যায় এটা ছিল কত শক্ত ও বাইরের কত আক্রমণ থেকে এই শহরকে বাঁচিয়েছে।

যেখানে দেওয়াল ছিল তা এখন তিন মাইল লম্বা পার্ক হয়েছে, আর তাতে আছে ভারি সুন্দর পায়ে চলার পথ।

এই নতুন শহরের ··রস মার্কেট নামে একটি জায়গাতে অপরাধীকে ফাঁসি দেওয়া হত। এইখানেই গ্যেটের ফাউস্ট-এর মারগুয়েরিটের ফাঁসি হয়েছিল।

এই চরিত্রটা কিন্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। মারগারেটা ব্রাণ্ড নামে এক মহিলা তার নিজের শিশুর হত্যায় সহায়ক ছিল বলে রস মার্কেটে তার ফাঁসি হয়। এই ঘটনা গ্যেটেকে খুব বিচলিত করেছিল।

সেণ্ট ক্যাথারিনেন চার্চে গেলাম বিশেষ করে, কারণ গ্যেটের ওখানে নামকরণ হয়েছিল।

এই শহরে ঘুরে বেড়িয়ে বারে বারেই মনে হচ্ছিল, গ্যেটের প্রভাব এখানে সব জায়গাতেই? না, আমার মনের মধ্যে তাঁর প্রভাব?

এখানকার বড় সাবওয়ে স্টেশনে ওরা কি সুন্দর মার্কেটিং সেণ্টার করেছে। ফ্রাঙ্কফোর্ট বলতে গেলে একেবারে নতুন শহর। গত মহাযুদ্ধে বোমায় বোমায় একেবারে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয় যেন

আনকোরা নতুন শহর—ফ্যাক্টরী থেকে মাত্র যেন বেরিয়েছে। কোরা গন্ধ এখনও গায়ে লাগা, বিশ্বাস করাও শক্ত যে এর পেছনে রয়েছে শ-শ বছরের ইতিহাস। কত কিছুর আনাগোনা, অনেক ওলট-পালট। কোন কিছুর ছাপ আমরা পাই না। রয়ে গেছে বইয়ের পাতায়।

যদিও এত সুন্দর শহর, কোন খুঁত নেই, তাও মনটা যেন কেমন-কেমন করছিল।

বারে বারে আমার নিজের দেশের কথাই মনে পড়ছিল। চকচকে না হোক, ঝকঝকে না হোক কি আসে যায়, কিন্তু তার মধ্যে সত্যিকারের প্রাণ আছে। শত শত বৎসর যে চলে এসেছে তার ছাপ আছে আর আছে তার অভিজ্ঞতা। সদ্যজাত শিশুর চাইতে তা অনেক বেশী ইন্‌টারেসটিং।

ফ্রাঙ্কফোর্টের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হচ্ছে এখানকার চিড়িয়াখানা। গত মহাযুদ্ধের বোমার চোটে এই চিড়িয়াখানার বেশীর ভাগ ঘর-বাড়ি ভেঙে যায় ও অনেক জন্তুজানোয়ার মারা যায়। তার আগে এটা দেখবার মত ছিল। এখন অবশ্য এখানকার পক্ষিশালা ইউরোপের মধ্যে সব চাইতে বড়।

এখানকার সিটি ফরেস্ট সত্যিই একটা বিরাট ব্যাপার। চার হাজার একর জুড়ে এই রিজার্ভ ফরেস্ট। স্টাটোয়াল্ডে অনেক—অনেক পুরনো গাছ আছে। ইউরোপের মধ্যে এখানেই প্রথম বীজ পুঁতে গাছ তৈরি হয়। তেরশো আটানব্বই সালে প্রথম ওক গাছ লাগানো হয়। ফ্র্যাঙ্কফোর্টের পশ্চিম দিকটাতে বলতে গেলে শুধু ইনডাস্ট্রি আর ইনডাস্ট্রি। এদিককার প্রত্যেকটা লোক—ছেলে হোক বা মেয়ে হোক ইনডাস্ট্রিতে কাজ করে।

সবরকম যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক, জুতো, ডাইং এবং আরও হরেকরকম জিনিস এখানে তৈরি হয়। Hoechter Farbwerke হচ্ছে জার্মানীর মধ্যে সব চাইতে বড় কেমিক্যাল প্লান্ট। এইদিকেই রয়েছে সব চাইতে পুরনো বাড়ি। জাস্টিনিনস্কার্চ গির্জা নয় শতকের।

তার কিছু দূরেই হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কফোর্টের আধুনিক শপিং সেণ্টার, ইউরোপের মধ্যে সবচাইতে বড় ও আধুনিক।

এই শপিং কমপ্লেক্স দেখতে এসে যা মনকে আনন্দে ভরিয়ে দিল তা এর আধুনিকত্ব, বিরাটত্ব বা জাঁকজমক নয়, তা হচ্ছে এর অভিনবত্ব। প্রকৃতি-মার কোলে সদ্যজাত নবযুগের শিশু।

বিরাট এক সুন্দর বনের মধ্যে হচ্ছে এই শপিং কমপ্লেক্স।

এখানে কি নেই? আশীটা স্পেস্যালাইজড স্টোর, দুটি সুপার মার্কেট, অনেকগুলো রেস্টুরেণ্ট। এ ছাড়াও আরও অনেক কিছু। গ্যাস স্টেশন থেকে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল অবধি। আর আছে সুন্দর সুন্দর ফোয়ারা, ফুলের বাগান।

এই ব্যাপারটা কত বিরাট তা একটা কথা বললেই ধারণা করতে পারবেন। তিন হাজার মোটর রাখবার পার্কিং প্লেস।

ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শান্তিনিকেতনের কথা মনে হোল। গুরুদেব মনেপ্রাণে বুঝতে পেরেছিলেন, প্রকৃতির সঙ্গে যোগ না রাখলে জীব তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলবে, হয়ে উঠবে মেশিন।

এখানকার মেলা আর প্রদর্শনীর ক্ষেত্রটা না দেখে আসা যায় না। আশী একর জমি নিয়ে তৈরি এটা। বাইশটা বিরাট বাড়ি রয়েছে আর রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট প্যাভিলিয়ন।

এখানে প্রতি বছর দুটা আন্তর্জাতিক মেলা হয়। বসন্তে ও শীতে। তাছাড়া ছোটখাটো ব্যাপার তো সারা বৎসর লেগেই আছে।

একটু এগিয়ে গেলেই পাওয়া যায় পৃথিবীবিখ্যাত বটানিক্যাল গার্ডেন পামেন্ গার্টেন অর্থাৎ পাম গাছের বন। রক গার্ডেন হচ্ছে আড়াই একর জমি নিয়ে।

এখানেই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় জলজ উদ্ভিদ আমাজনের ভিক্টোরিয়া রেজিয়া লিলি। এর পাতাগুলো হচ্ছে ছয় ফুট লম্বা। এই পাতা এত বড় ও শক্ত যে একটা বাচ্চাকে এর ওপর রাখতে পারা যায়।

আটশো রকমের ক্যাকটাস আছে আর আছে পোকামাকড় খানেওয়ালা গাছ।

ফ্র্যাঙ্কফোর্ট দেখা শেষ করে আমরা চললাম হেসে স্বাস্থ্য ফেরানর মুলুকের দিকে। এই দেশটাকে বলা হয় Tce land of Healing Spiings অর্থাৎ সারানিয়া ফোয়ারার দেশ। অনেক আশা নিয়ে তো চড়ে বসলাম কোচে এবং। একথাও জানি নিরাশ হব না।

॥ এগার ॥

চব্বিশ পরগনার মধ্যে যেমন কলকাতা তেমনি হেসে প্রদেশের মধ্যে হোল ফ্রাঙ্কফোর্ট। তাই ফ্রাঙ্কফোর্টে আসার আগে ঠিক করেছিলাম এখান থেকেই ছোট ছোট ট্রিপ দিয়ে চারপাশটা দেখব।

সকালে খাওয়া চুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তিনজনে। সেদিন সকালে উঠেই বলেছিলাম রোজ প্ল্যান করা ভাবে চলতে চলতে যেন কেমন লাগছে। একদিন যাওয়া যায় না অজানার সন্ধানে! ঠিকানাহীন ঠিকানায়? পথকে সম্বল করে চলার আনন্দে দুচোখ খুলে দু'পা চালিয়ে?

গ্রীম ভাইদের ফেয়ারী টেইল্‌সের পরীদের মত। ছোটবেলায় এদের বই পড়তে পড়তে মনে হোত আমাদের কেন তাদের মত হবার এত ইচ্ছা!

নিশ্চয়ই ওরাই আমরা হয়ে এসেছি। মনটা সঙ্গে এনেছি কিন্তু জন্মজন্মান্তরের ডানাগুলো গেছে কাটা। তাই মনটা রয়ে গেছে, শক্তিটা চলে গেছে।

সত্যি কথা হচ্ছে গ্রীম ভাইরা যেখানে জন্মেছিলেন চলেছি সেই দিকে। তাই মনটা হয়ে উঠেছে চঞ্চল। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে কিছু দূরেই হচ্ছে অফেনবাখ শহর। এর মার্কেট স্কোয়ারে রয়েছে এক বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ গ্রীম ভাইদের স্মরণে। এইখানে জেকব গ্রীম জন্মেছিলেন সতেরশ ছিয়াশীতে। জেকব নাম করা ফিললজিস্ট অর্থাৎ ভাষাতত্ত্ববিদ্ ছিলেন।

আর একটু এগিয়ে গেলেই রয়েছে একটা ভারী সুন্দর জায়গা। এখানে বলে গ্রীম ভাইদের ছেলেবেলাটা কেটেছে। আর আছে এখানে দুটি ছোট গরম জলের ফোয়ারা, বাড অরব ও বাড সোডেন নামে। এখানকারই স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ফিলিপ রেইস টেলিফোন বের

করেছিলেন এবং ঠিক এই সময়ই আমেরিকা থেকে টেলিফোন বের করেছিলেন গ্রাহাম বেল।

অফেনবাখের যেটা সব চাইতে দেখবার মত জিনিস তা হচ্ছে পৃথিবীবিখ্যাত লেদার মিউজিয়াম। যত রকমের চামড়া হতে পারে তার তৈরি নানা যুগের, নানা দেশের, নানা রকমের জিনিস এখানে আছে।

এখান থেকে আমরা গেলাম ফ্র্যাঙ্কফোর্ট-এর প্লেগ্রাউণ্ড, টাউনাসে। ওখানে আছে জার্মানীর একটা নাম করা গরম জলের ফোয়ারা বাড হমবার্গ। সেই শত শত বৎসর আগে রোমানদের রাজত্বকালেও এই ফোয়ারার কথা সবাই জানত। চারিদিক থেকে লোকেরা আসত শরীর ও মন দুটিরই উন্নতির জন্য।

আজকে মনটিকারলো পৃথিবীবিখ্যাত। কিন্তু তার আগে বাড হমবার্গ ছিল মনটিকারলোর জায়গাতে। জুয়ো ও নানা ধরনের অকীর্তি ফূর্তির ব্যবস্থা ছিল সেখানে। পৃথিবীর চারিদিক থেকে রাজা-রাজড়ারা ও আমীর ওমরাহরা এসে ভিড় করত এখানে।

তারপর সৃষ্টি হয় ফ্রান্সের মনটিকারলো।

এখানে ভারী সুন্দর দুটি জিনিস দেখলাম শ্যায়ামিজ মন্দির ও রাশিয়ান চ্যাপেল।

আর একটা জায়গার কথা মনে রাখবার মত, ওয়েৎসার একটা ছোট্ট ক্যাথিড্রেল টাউন যেখানে গোটে শার্লটের প্রতি আশাহীন প্রেম অনুভব করেছিলেন। সেই বেদনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর পৃথিবী-বিখ্যাত কাব্য ওয়েরথার। গোটের এই যে অবিনশ্বর প্রেম তা ছিল মনের মধ্যে, তার প্রকাশ শুধু কাব্যে। পার্থিব সব কিছুর ধরা ছোঁয়ার বাহিরে এই যে স্বর্গীয় প্রেম তাঁর তুলনা আমরা পাই আমাদের কবি বিদ্যাপতির রাণী লছিমার প্রতি প্রেমে। তাই কবির মর্মস্পর্শী কবিতায় আমাদের মন গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে।

> "ই ভরা বাদর মাহ ভাদর
> শূন্য মন্দির মোর।"

ফ্র্যাঙ্কফোর্টে ফিরে এসে মনের মধ্যে একটা কথাই বারে বারে তোলপাড় হচ্ছিল—পৃথিবীর সব বড় সাহিত্যসৃষ্টি কি শুধু দুঃখের দান? আঘাতের ছোঁয়া না পেলে কি অন্তরের অন্তস্তলে যে মন আছে তা আত্মপ্রকাশ করে না?

আমার মনে হোল পৃথিবীর একশজনের মধ্যে ত নব্বই জনই কত দুঃখ পায়। কই তারা কি করতে পারে? তার মানে দুঃখ পাওয়াটাই বড় কথা নয়, প্রকাশটা বড় কথা। বেশীর ভাগ আমাদের মত সাধারণ মানুষ দুঃখটাই পায়, আর কিছুই নয়।

আমরা যাচ্ছি কাসেলের দিকে। ওখানে গিয়ে দেখলাম যা শুনেছিলাম ঠিক তাই। ওখানকার অধিবাসীরা এখনো তাদের আগের নিজস্ব বেশবাস রেখেছে। ও এমন কি তাদের পুরোন রীতিনীতিও।

অল্প বয়সী ছেলেরা আঁটসাঁট কুর্তা বা কোট পরে। সামনে থাকে বোতামের সারি আর তারা পরে ব্রীচেস, পাতলা লম্বা বুটজুতো ও ফারের টুপি। অল্প বয়সী মেয়েরা মাথায় দেয় ছোট্ট লাল টুপি, ছোট হাতের জামা।

পোশাক-আশাক দেখে ও গান শুনে চোখের সামনে ভেসে উঠল গ্রীম ভাইদের গল্পের কথা। পরীদের পোশাকের বর্ণনা ওঁরা এদের থেকেই যে নিয়েছিলেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সবটাই শুধু আকাশকুসুমের ওপর সন্দেহ নয়, বাস্তবের ছোঁয়াও রয়েছে তাদের কল্পনার রাজ্যে।

এখানকার প্রভিন্সিয়াল মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী দেখবার মত। বিশেষ করে গত মহাযুদ্ধে কি করে জানি এটা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। তাই সেখানে আমরা পাই নামী ও দামী চিত্র-শিল্পীদের শিল্প—রেমব্রান্ট, রুবেন্স, হালস, ভ্যানডাইক ইত্যাদি।

কাসেলকে সিটি অব পার্কস মনে উদ্যান নগর বলা হয়। সব চাইতে নাম করা হচ্ছে বারগ পার্ক, এতে আছে ফোয়ারা, পিরামিড—মিশরের পিরামিড কাঁচের মন্দির, দুর্গ, আর আছে হারকিউলিসের বিরাট স্তম্ভ। ফ্র্যাঙ্কফোর্টের হোটেলে রাতের খাবার পর বসে আকাশপাতাল ভাবছিলাম।

মেয়ের বাবা ও মেয়ে শুতে চলে গেছে। আমার ত খাপছাড়া মন। কি দেখি, কি করি তাই ভাবছি। এইটুকু সময়। এর মধ্যে সব কিছু ত দেখতে পারব না। ভাবতেই মনটা মুষড়ে পড়ছিল। আবার কি আসা হবে এই দেশে? হঠাৎ কানে এলো এক জার্মান ভদ্রলোক তার ছেলের ইংরেজ বন্ধুকে দেশের কথা অনেক বলে যাচ্ছিল। ইংরেজীতে বলছিল। এখানকার অনেকেই ইংরেজী জানে। ফ্রেঞ্চদের মত ইংরেজী জেনেও না বলার রোগে ওরা ভোগে না।

মনটা খুশীতে ভরে গেল। এই দেশের কথা জানবার সুযোগ তিনি করে দিলেন।

উঠে গিয়ে বললাম, 'আমি ভারতবাসী। তোমাদের দেশ দেখে মুগ্ধ। এই দেশের কথা জানতে চাই। তোমাদের কাছে বসব কি?'

ভদ্রলোক খুব খুশী। হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই, একশবার। তুমি দূরদূরান্ত থেকে আসতে পার আর আমরা বলতে পারি না? কে বলে, তোমার দেশের মেয়েরা লাজুক, কথা বলতে পারে না? তুমি যদি তোমার দেশের প্রতীক হয়ে থাক, তবে বলব তোমার দেশ মেয়েদের ব্যাপারে ভাগ্যবান'।

ভাগ্যবান কি না জানি না। তবে আমাদের মেয়েদের আদর্শ আছে অনেক! তাদের কাছে আমি নগণ্য, অতি সাধারণ! প্রাচীন-কালেও আমাদের দেশের মেয়েরা বেদ উপনিষদের তত্ত্ব নিয়ে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে আলোচনা করত।

সবাই গোল হয়ে বসা গেল। ভদ্রলোক সবার জন্য কফির অর্ডার দিলেন।

'তুমি ত মনে হয় এই দেশের কথা অনেকটাই জান, তাই না?'

'তা বটে। অনেকটা না, কিছু কিছু। সত্যি বলতে কি কিছুই বেশী জানি না। তোমাদের আমি ছোটবেলা থেকেই বিস্ময়ের চোখে দেখেছি। মনে হয়েছে এদের ভেতরের আগুন ভিসুভিয়াসের মত। অফুরন্ত, অজেয়। শত দুর্দশা এদের দমাতে পারে না। মুহূর্তে আবার এরা সতেজে চলতে আরম্ভ করে।'

'জান ? আমাদের অনেক অনেক আগে তাই ছিল। কখনোও কোন কিছুই আমাদের দমাতে পারত না। তারপর হয়ে গেল সেটা ডেড্ ভলকানো, নিঃশেষিত আগ্নেয়গিরি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলে আগ্নেয়গিরি কখনো সত্যিকার নিঃশেষ হয় না। শ' শ' বৎসর পরে হোলেও তার আবার জেগে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়।

তাই দেখনা, কত বৎসর পরে আবার আমরা সগর্বে ঘোষণা করলাম, আমরা মরিনি, আমরা বেঁচে আছি এবং বাঁচব। সব কিছু আমরা জয় করব।

'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়।'

এই যা, কোথায় তোমার কথা শুনবো বলে বসলাম না! তোমাকেই আমার কথা শোনাতে শুরু করলাম। কি কাণ্ড বলত ?'

'আমি শুধু তোমার কথা শুনছি, তোমাকে দেখছি আর ভাবছি তোমার কথা যদি সত্যি হয় যে তোমার দেশের তুমি একজন সাধারণ মেয়ে তবে সে দেশ কোন দিনও পিছিয়ে থাকতে পারে না, থাকবে না।'

'শোন, আমরা কিন্তু ডি-রেল্‌ড হয়ে গেছি। লেট্ আস ট্রাই টু বি অন্ দি লাইন. কি বল ?'

'সত্যি ত আমাদের ফিরে আসা যাক আমাদের দেশে।

'আচ্ছা কিছু মনে কোর না, তোমাদের মধ্যে দু ধরনের চেহারার লোক খুব দেখা যায় ; বাদামী চুল, বাদামী চোখ আর সোনালী চুল ও নীল চোখ।'

'ঠিক বলেছ। দক্ষিণের লোকেদের হচ্ছে বাদামী চুল ও বাদামী চোখ ; উত্তরের লোকেদের সোনালী চুল এবং নীল চোখ।

মেইন নদীর উত্তরে হচ্ছে কর্মঠ লোকদের বাস আর তাদের হচ্ছে সোনালী চুল ও নীল চোখ। সৃষ্টিকর্তারই এ এক অদ্ভুত সৃষ্টি। মেইন নদীর দুধারে দু ধরনের লোক। শুধু চেহারাতেই নয় ; স্বভাবে, পোশাকে এমন কি ধর্মে, কালচারে।

দক্ষিণে তুমি দেখবে বেশীর ভাগ লোকই হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক। তাই দক্ষিণের দেশেই পাবে চ্যাপেল আর শ্রাইন। ধর্মের দিনগুলো

ওরা প্রকাশ্যভাবেই পালন করে। লেন্টের আগের দিন আনন্দ মেলা শুরু হয়। মিউনিক, মেইন, কোলন্ ও ডুসেলডর্ফ শহরেই কারনিভ্যাল খুব জাঁকজমকের সঙ্গে হয়। এরা লেন্ট থেকেই পার্টি ডান্স ইত্যাদি নিয়ে মেতে ওঠে ও তা চলে অ্যাশ ওডেনেস ডে—অবধি।

দক্ষিণের কালচার অনেক তফাত। বিশেষ করে স্থাপত্যের দিকে। এই দিকে আমরা পাই অস্ট্রিয়ান, রোমান ও ইটালীয়ান প্রভাব। প্রতিটি চার্চ রাজপ্রাসাদ এমন কি সাধারণ বাড়িতেও। গির্জা কারুকার্যখচিত। এমন কি দক্ষিণের গথিক গির্জার চাইতে অনেক সূক্ষ্ম কাজ রয়েছে।

উত্তরই আর্থিক দিক দিয়ে বেশী ভাল। তার দুটো কারণ—লোকেরা কর্মঠ ও প্রকৃতিও দরাজ হাতে বেশী দিয়েছে।

বোধ হয় সেই কথাটা ঠিক—যারা নিজেরা খাটে তাদের ভগবান দেন হাত ভরে।—Goc helps those who help themselves.'

হঠাৎ আমার মনে হোল ভাল লোক পেয়ে বড্ড বেশী বকিয়ে নিচ্ছি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত আড়াইটা বাজে। খেয়াল করিনি কোন ফাঁকে দুটা ছেলে কেটে পড়েছে। রয়ে গেছি আমরা দুজন।

বললাম, 'তোমার কাছ থেকে অনেক জানলাম, অনেক শিখলাম। এই রাতটি আমার মনে চিরদিন তারার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।'

হেসে সে বলল, 'ম্যাডাম্, একটা ভুল হয়ে গেল। তারার আলো ত দিনে ম্লান হয়ে যায়। তাই কালকের আলোয় তুমি সব ভুলে যাবে।'

'বেশ তাই যদি বল, তোমার আপত্তি না থাকলে ভোরের আলো, না দেখা পর্যন্ত এইভাবে গল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যাক। তবে বুঝবে, ভোরের আলোয় তারার উজ্জ্বলতা ম্লান হয় কিনা।'

সে বলল, 'সেই বেশ হবে। মনে আনন্দ থাকলে শরীরে ক্লান্তি আসে না। মনে হয় এইভাবে সীমাহীনভাবে আমরা কথা বলে যেতে পারতাম।'

ফ্লাস্কে কফি রাখা ছিল। দুজনে তাই ঢেলে নিয়ে জুত হয়ে বসলাম।

হঠাৎ দেখি ঘুম ভেঙে আমাকে না দেখে উনি এসে দাঁড়িয়েছেন, 'কি ব্যাপার ? এখনও তোমরা গল্প করছ ? রাত যে তিনটে হোল।'

আমি বললাম, 'তুমি ত জাননা আমি যে সোনার খনির সন্ধান পেয়েছি।'

'আমি যে পাইনি তা কি করে জানলে ? তাই আমরা ঠিক করেছি বাকি রাতটুকু এইভাবেই কাটিয়ে দেব।'

'ওরে বাবা, আমি এতে নেই। এই বেলা গিয়ে শুয়ে পড়ি।' এই বলে উনি কেটে পড়লেন।

এইখানে চুপি চুপি একটা কথা বলে রাখি, উনি একটু ঘুমকাতুরে।

মানুষের প্রথা চালচলন অনেকটাই নির্ভর করে পুরোন ঐতিহ্যের উপর। তবে এটাও ঠিক জলবায়ু ও আশপাশের জায়গার উপরও কিছুটা করে।

সেইজন্যই আমাদের দেশে যেদিক দিয়ে রাইন, মোসেল মেন নদী বয়ে গেছে সে দিকটাতে পৃথিবীর সেরা ওয়াইনের সঙ্গে এক তালে চলতে পারে সেইরকম ওয়াইন হয় এবং বেশ বেশী পরিমাণে।

তাই এদেশে গেলেই দেখতে পাবে মানুষরা বেশীর ভাগই খুব দিল খোলা। গান বাজনা নিয়ে মেতে আছে। মন মেজাজ ওদের সহজে খারাপ হয় না। সবকিছুই হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে নিতে পারে। অবশ্য মাতলামোটা একটু বেশী ; আর একটু বেশী কথা বলে।

সেইসব জায়গা হচ্ছে লুনেবার্গ পাহাড়িয়া অঞ্চলে ও উত্তর-পশ্চিমে ওয়েগার নদীর মোহনা ঘিরে জলা নিচু জায়গা। এখনও সেখানকার চাষীভাইরা অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছে। কতরকম কুসংস্কারে যে ভুগছে।

গত মহাযুদ্ধের পরেও মন্ত্রতন্ত্রের উপর বিশ্বাস। ওঝা জাতীয় লোকের ঝাড় ফুঁকে ভাল হবেই—এই দৃঢ় ধারণা অনেকেরই ছিল। এখন অবশ্য প্রায় সেটা উঠে যাচ্ছে।

'অনেক ত বললাম দেশের কথা। এখন একটু নিজেদের কথা বললে কি কোন ক্ষতি আছে ? ভোর হতে হতেই দুজনের যেতে হবে দুপথে।

জীবনে কোন দিন দেখা হবে কিনা জানি না। তাই জানতে ইচ্ছা করছে তুমি কে? আমার কথা ত তুমি আগেই জেনে নিয়েছ।'

সে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার কথা আর এমনকি। এ দেশের বেশীর ভাগ লোক যা আমিও তাই। মানে, ইঞ্জিনীয়ার। বিয়ে করেছিলাম ভালবেসে। তখন দুজনেই ভাবছিলাম, এই আমাদের চরম ভালবাসা। দুজনেই যুগযুগান্তর ধরে এক পথে চলব। দশ বৎসর পরে বুঝলাম সত্যিকার ভালবাসা এত সহজ নয়। তাই বন্ধুত্বের মধ্যেই আলাদা হয়ে গেলাম। তা প্রায় বছর পাঁচেক হবে।

ও ভালবাসার লোক পেয়েছে। মনে হয় সুখী হয়েছে। সুখে থাকুক। আমি এখনও পাইনি। কোন ক্ষোভ নেই। এই যাকে দেখলে আমার একটি মাত্র ছেলে। বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ে। এক ছুটিতে আসে আমার কাছে। অন্য ছুটিতে মার কাছে। ট্যুরে এসেছিলাম তাই ছেলেকে দু'দিনের জন্য হোটেলে এনে কাছে চেয়েছিলাম। কাল চলে যাব কর্মক্ষেত্রে। ও যাবে বোর্ডিংয়ে।'

ওর কথা শুনতে শুনতে কবিগুরুর একটা কবিতা থেকে মনে আসছিল।

'মনে করাব না আমি শপথ তোমার ;
আসা যাওয়া দুদিকেই—
খোলা রবে দ্বার।'

এদের জীবনে শেষের দিকটা মিলবে কিনা জানি না।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তুমি কোথায় যেন চলে গেছ, কি এমন ভাবছ?'

'ঠিকই ধরেছ, ভাবছিলাম কত সুন্দর সহজভাবে তোমরা কঠিন জিনিসটা নাও। এতেই বোঝায় তোমাদের মনের প্রসারতা।'

'ঐ দেখ, ভোর হয়ে আসছে। পাঁচটা বাজে। এখন যদি গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক শোয়া যায় তবে তুমিও সারাদিনের চরকি পাকের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। আর আমিও কাজের জন্য শক্তি পাব। তাছাড়া তোমার ত চোখ ছোট হয়ে আসছে।'

'ঠিকই বলছ টান টান হয়ে একটু শুতে না পারলে সত্যি চলবে না।

'জার্মান স্বভাবের কথা একটু না বলে থাকতে পারছি না। এই দেশের লোকেরা শৃঙ্খলা ভালবাসে যাকে বলে নিয়মানুবর্তিতা, অরডার্লি লাইফ। তাছাড়া কর্তৃত্ব মেনে চলাটা রয়েছে আমাদের রক্তের মধ্যে। বাড়িতে, স্কুল, কলেজে কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই সবাই উপরের লোককে মেনে চলে। তাই বিশৃঙ্খলাটা আমাদের কম। চলবে না, চলবে এসব আমাদের নেই। অন্যদেশের মত স্ট্রাইক, গোলমাল আমাদের দেশে নেই।

লিডারদের ওপর আমাদের আছে বিশ্বাস আর তাদের কাছে আমরা পাই স্নেহ মমতা, ভালবাসা।'

আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বেশী কিছু বলতে পারলাম না। মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। শুধু বললাম, 'আবার দেখা হবে।'

ও শুধু হাতটা জোরে চেপে ধরল।

॥ বার ॥

মিউনিক। প্রতীক বলা চলে গোটা জার্মানীর।

এর সত্যিকারের নাম হচ্ছে "মুন্‌চেন"। এই দেশটাকে আবিষ্কার করেন কয়েকজন মঙ্ক মিলে। তাই এর নাম "জু ডেন মোন্‌চেন"—আট দি মঙ্কস্‌। সেইজন্য এর কোর্ট অব আরমসে রয়েছে মঙ্কের প্রতিচ্ছবি।

ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে একটা ব্যাপার জানলাম—, অনেক জায়গাই আবিষ্কৃত হয়েছে সাধুদের দ্বারা। তাই মনে হয়, তখনকার দিনের সাধুরা ধর্ম ছাড়াও আরও কিছু করে গেছেন।

এই শহরটা ওয়েস্ট জার্মানীর মধ্যে তৃতীয় বড় শহর ও খুবই পুরনো। এগারশ দুই খ্রীষ্টাব্দে এর নাম প্রথম নথিপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। মিউনিক হচ্ছে ব্যাভেরিয়া স্টেটের রাজধানী। কলকাতা যেমন পশ্চিমবঙ্গের।

ওখানে যাবার আগেই ওখানকার বিয়ারের প্রশংসা শুনেছিলাম। এমন কি শুনেছিলাম বিয়ারের চারিদিকেই ঘুরছে মিউনিক শহরের জীবন-স্পন্দন।

বন্ধুরা বলেছিল, এই শহরকে যদি বুঝতে চাও তবে দেশ দেখাকে সহজভাবে নিও। মিউনিকের আত্মাকে জানতে পারবে যদি বিয়ার হল বা বিয়ারের বাগানে সময় কাটাও। সুন্দর দিনে রোদের ঝিকিমিকির মধ্যে খোলা জায়গায় বিয়ারের মগ হাতে যদি বেশ কিছুক্ষণ না কাটাও, এই দেশকে বুঝতে পারবে না। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে বিয়ারের মগ হাতে 'বিয়ার হলে' যদি উদাসী মন নিয়ে না বস তবে এ দেশ তোমার অজানা রয়ে যাবে।

বলেছিলাম, "বন্ধু, বিয়ারই সব নয়। জেনো, মন বা দেশকে জানতে কোন বাইরের হাতিয়ারের দরকার হয় না। শুধু চাই অনুভূতি-প্রবণ মন। দেখো, আমি অনেকের চাইতে বেশী চিনে আসব।"

স্টেশন থেকে বেরিয়ে স্টাকাস নামে এক চৌমাথায় গেলাম। সেখানে দেখলাম "গ্রে প্যালেস অব জাস্টিস্" । এই বিরাট বাড়িটা বোমায় ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়। এখন অবশ্য এটা এমন সুন্দর-ভাবে নূতন করে গড়েছে যে মোটে বোঝাই যায় না এর গায়ে কখনও কোন আঁচড় লেগেছিল। যুদ্ধে ওরা যেমন ধ্বংস হয়েছিল, যুদ্ধের পরে ওরা তেমনি গড়ে নিয়েছে নিপুণভাবে।

ওখান থেকে আমরা গেলাম ব্যবসাকেন্দ্রে, মানে যেখানে রয়েছে বিরাট বিরাট দোকান। এই রাস্তাটার নাম সোনেনস্ট্রাসে। এখানকার চারিদিকটা দেখে মনে হোল সত্যিকার ইন্দ্রধনুর ছটা বলে যে কথাটা রয়েছে তারই পূর্ণ বিকাশ। ইন্দ্রদেবের রাজধানীর এক টুকরো উল্কার মত এখানে এসে পড়েছে।

কি আছে আর কি নেই। এ যেন এক ডানা-কাটা পরী। পরীর মত মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ছুঁতে ভয় হয়। এ যেন তেমনি মনে হচ্ছিল।

পকেট হাল্কা, ঢুকে ফেঁসে যাই—এই ভয় মনের মধ্যে। আবার একটা দারুণ আকর্ষণ—না দেখে, না জেনে যাব ? ঢুকেই পড়ি।

বিকিকিনির আর একটা কেন্দ্র হচ্ছে মাটির নিচে—মানে আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে। এটা বিরাট ব্যাপার। চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া যায় বা সাধারণ সিঁড়িও আছে। দু ধরনের ব্যবস্থাই আছে।

ওখান থেকে আমরা গেলাম গতকালের বা গত যুগের শহরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এটা প্রায় ধ্বংসের স্তূপে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন অবশ্য অনেকটাই বানানো হয়েছে।

ওখানে রাস্তার দু'ধারে সুন্দর সুন্দর দোকান। লোকেরা পায়ে হেঁটে নিশ্চিন্ত মনে কেনাকাটা করছে। কোন গাড়ি-ঘোড়া ওখান দিয়ে যেতে পারে না। ব্যবস্থা বেশ ভাল। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে শহরটাকে যেমন বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, তার সঙ্গে মানুষগুলোকেও। এদিককার লোকেরা যেন অন্যদিকের জার্মানদের চাইতে হাসিখুশী হাল্কা মেজাজের।

গ্রীষ্মের ছুটি। ছেলেমেয়েদের দেখা যাচ্ছে বিয়ার হলে বিয়ারের মগ হাতে রঙিন মনে জীবনটাকে উপভোগ করছে। জার্মানীর দক্ষিণ-বাসীরা একটা কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, "হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়"।

মনে হয়, এদিকটাতে যে এত বিয়ার ও ওয়াইন হয় সেটাই বোধ হয় এই ধরনের মনের জন্য দায়ী।

তা বলে কি ওরা কাজ করে না? কাজের সময়-চুটিয়ে কাজ করে। এটা তাদের রক্তের মধ্যে। বিয়ার খেয়ে আনন্দ করে বলে কি নিয়ম ভেঙে বেড়ায়?

না, নিয়মানুবর্তিতা ওদের রক্তের মধ্যে। তাই কোন দুর্দিন তাদের দমিয়ে রাখতে পারে না। তারা অজেয়। আমাদের চারিদিকে দেখি পুরনো কাহিনী নিয়েই দিন গড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ বৎসর আগে এই ছিল আমার। এই অবস্থা ও কথা বোধ হয় কোনদিনই শেষ হবে না।

আগের দিন সন্ধ্যায় পা ফেলেছি এই শহরে। সারাদিন ট্রেনে কেটেছে। জার্মানীর এত শহরে ঘুরেছি। কিন্তু ক্লান্ত বোধ করিনি। এক নাগাড়ে ঘোরা খাবার কথাটা মনে করিয়ে দিল। তাই সামনে যে রেস্টুরেন্ট পড়েছিল ওতে ঢুকে, না ভেবে, খাবার যোগ্য যা পেয়েছিলাম তাই তিনজনে পেট ভরে খেয়েছিলাম।

তারপর টুরিস্ট অফিসের ঠিক করা আস্তানায় মানে হোটেলে ঢুকে ঘুম। ভোরে উঠে কিন্তু মনে হোল কোনদিনই ঘোরাঘুরি করিনি। দিব্যি আয়েসে আছি। একরাত্রির বিশ্রামে সবাইকেই নূতন মানুষ করে দিল।

অনু তো উঠেই লাফালাফি করতে আরম্ভ করল। "এভাবে চলবে? এত সময় নষ্ট করা হোল!"

"সে আবার কি? ট্রেনে তো আর পা চালানো যায় না।"

"তাই বুঝি বলছি। ঘুমিয়ে যে এত ঘণ্টা নষ্ট করা হোল, সেই ভাবনায় পড়ে গেছি। আজ সারা রাত আর 'ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করা হবে না। কি বল?'

'কি বুদ্ধি! এখনও তো সারা জার্মানী। তারপর সুইজারল্যাণ্ড। অনেক দিন পা চালাতেঃ হবে। তাই রাতে চোখ বুজতেই হবে। বুঝলি?'

'অভি সমঝলাম।'

এখন তাই আরাম করে একটা কাফেতে ঢুকেছি দুপুরের খাবার জন্য। খুঁজে খুঁজে এখানকার একটি বিশেষ খাবার নিয়েছি। ব্রথেনডেল—মুরগীর মাংস দিয়ে তৈরি। এর সঙ্গে আলু সেদ্ধ আর রুটি। তাছাড়া গাজরের সুপ। শেষে ভাল পেস্ট্রি, কফি উইথ ক্রীম। বেশ তৃপ্তি করে খেলাম। সবারই হাতে বিয়ারের মগ।

'দেখ, সবাই কেমনভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। মনের ভাবটা যেন, আহা কি অমৃত থেকে তোমরা বঞ্চিত হ'লে, বলল মেয়ে।

'আমরাও তো তা ভাবতে পারি', সে বলল।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম বেশ কিছু কাল থেকে আমাদের দেশে যেমন গল্পগুজবের হিড়িক পড়েছে পুরাকালে নিশ্চয়ই তা ছিল না। হাতে কিছু না থাকলে কখনো আড্ডা জমে? তাই তো, হয় চায়ের কাপ বা কফি বাটির হ্যাণ্ডেল, নিদেনপক্ষে মুখে ধুঁয়ো। আর এক ধাপ চড়তে পারলে তো কথাই নেই।

আমরা গেলাম ফ্রাউয়েনকারকে—শহরের নামী ক্যাথিড্র্যালে। মিউনিকের কথা বললেই সকলের চোখে ভেসে ওঠে এই গির্জার জোড়া চুড়ো দুটা। এটি পনের শতকে তৈরি হয় ব্যাভেরিয়ান গথিক স্টাইলে। গত মহাযুদ্ধে এটি বেশ ভালভাবেই ভেঙে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ঠিক তেমনি বেশ ভালভাবেই—এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এটি আবার নিখুঁতভাবে তৈরি করে নেয়।

গত মহাযুদ্ধের হাত থেকে খুব কম জিনিসই রক্ষা পায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যাভেরিয়ার সম্রাট লুডউইকের স্মৃতিস্তম্ভ আর তাঁর ব্রোঞ্জে তৈরি মূর্তি।

দিনটি ছিল কপাল গুণে মেঘশূন্য। তাই চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে এর একটি চূড়াতে উঠে বড় সুন্দর দৃশ্য দেখলাম। তিনশ বত্রিশ ফুট উঁচু

চূড়ার উপর থেকে শহর ছাড়িয়ে সুদূর আল্‌স্‌ পাহাড়ের উঁচু চূড়াও দেখতে পেলাম। ঠিক মনে হোল দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা।

এখান থেকে আমরা গেলাম ন্যুস রাথাউস্‌—নূতন টাউন হল দেখতে। ওখানকার দুশ আটাত্তর ফুট উঁচু চূড়াতে উঠলাম চলমান সিঁড়ি দিয়ে। এই চলমান সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে এত মজা লাগে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাক, ব্যাস্‌।

এই সব নানা সুখ-সুবিধার জন্য কত ইলেকট্রিসিটির দরকার। সবই তো বিজলীর ব্যাপার। আমাদের দেশে ইলেকট্রিসিটি আমরা এত কম উৎপাদন করি যে কোন কিছু ভাবাই যায় না। রাতের আলো ও কিছু ফ্যাক্টরি চালু রাখতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সবই হবে।

এইটি বানানো হয় গত শতাব্দীর মধ্যভাগে নিও গথিক স্টাইলে। এর অপূর্ব কারুকার্য দেখতে দেখতে চোখ যেন আর ফেরাতে ইচ্ছা করে না। গত মহাযুদ্ধে এটির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। অবশ্য এখন আর তা বুঝবার জোটি নেই।

এখানকার ধনুকের মত বাঁকা ছাতাওয়ালা চূড়ায় যে সব সুন্দর থাম আছে তার ফাঁকগুলি কাঁচের জানালা দিয়ে বন্ধ করা। সেই প্রতিটি কাঁচের জানালার পেছনে রঙিন সব মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক এগারটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জানালা খুলে যায় ও রঙিন মূর্তিগুলি বেরিয়ে এসে ঘুরতে শুরু করে।

এই পুতুলের সারি দুভাগে আসে। উপরের দিকে চোদ্দশ পঁচাত্তরে ডিউক কৃস্টোফার মিউনিকের লুবলিনের কাউন্টকে এক টুরনামেন্টে হারিয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনাটি হয়েছিল এক রাজপুত্রের জাঁকজমক-ওয়ালা বিয়ের আসরে। এই ঘটনাটি পুরোপুরি দেখা যায় পুতুলদের মাধ্যমে। নিচের দিকে দেখা যায় "কুপারস্‌ ডান্স"। তাও পুতুলরাই করে। এত কাজ-পাগলা জাত—কিন্তু শিশুর মত সরল আনন্দেও মাততে পারে। ভাঙাগড়া খেলায় সমান ওস্তাদ। আবার অন্যদিকে দেখতে গেলে এদের মত সঙ্গীত আর সাহিত্যের বিকাশের জুড়ি মেলা ভার।

প্রতিদিন ঠিক এগারোটা থেকে এটি আরম্ভ হয়। আঠারশ সাতষট্টি থেকে এইভাবে প্রতিদিন চলে আসছে। ভাবতেই গা-টা কেমন করে ওঠে। মানুষের কি এক অপূর্ব সৃষ্টি।

প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে তিরিশ বৎসর যুদ্ধের পর সুইডিশরা যখন মিউনিক জয় করে নেয় তখন কিন্তু তারা এই শহরটির এতটুকুও ক্ষতি করেনি। ব্যাভেরিয়ার রাজা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই ঘটনাটি চিরস্মরণীয় করবার জন্য শ্বেতপাথরের একটি অতি সুন্দর ম্যাডোনার মূর্তি করান। তাই এই জায়গার নাম হয় মারিয়েনসোল।

এর কাছাকাছি আরও গির্জা ছিল। তাছাড়া ছিল সেণ্ট জন নেপোমুক। অবশ্য বেশীর ভাগ লোক এই গির্জাটিকে জানে অ্যাশাম চার্চ নামে। এর একটা বিশেষ কারণ আছে। এই গির্জাটা বানিয়েছিল দুই অ্যাশাম ভাই। দুই ভাই-ই তখনকার দিনের নামী স্থপতি। শুধু ভালবেসে তৈরি করেছিল এটি। রাজার কাছ থেকে একটি কানাকড়িও নেয় নি।

যুদ্ধ ও সময়ের শত আঘাতেও কিন্তু এর ভেতরের অপূর্ব কারুকার্য অক্ষত রয়ে গেছে। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ঈশ্বরের প্রতি প্রাণঢালা ভালবাসা যা তারা দিয়েছিল, মনে হয়, তা ঠিকই তাঁর পায়ে পৌঁছেছিল। তাই বলতে গেলে এটা অক্ষত রয়ে গেছে এত যুগ পরেও।

অন্ধকার হয়ে আসছে। সোজা আমরা গেলাম ইজার নদীর ধারে। নদীর ধারে এলে বড় ভাল লাগে। সব কিছুর উপরে প্রকৃতি। মানুষের শত চেষ্টা তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। ওখানে বসে তিনজনে চা ও টা খাওয়া হোল। নদীর ধারে যখন বসে ছিলাম তখন এক আমেরিকান এসে বসল আমাদের মাঝখানে।

এরা স্বভাবতই মিশুক ও ইন্‌ফরম্যাল। যেমন চট করে এরা বন্ধুত্ব করতে পারে, ভুলতেও পারে তেমনি চট করে। যাই হোক আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। ও এসেছে এক মাসের জন্য কি একটা কাজে। আর দশদিন বাকি আছে দেশে ফিরবার।

"আচ্ছা, তুমি তো এতদিন আছ। এ দেশের লোকদের আমাদের চাইতে অনেক বেশী চিনেছ। বল তো, ওদের স্বভাবের বিশেষ কোন দিক, যেটা তোমার চোখে ঠেকেছে?"

"বলি, শোন তবে। ওরা আশ্চর্য রকম ফরম্যালিটির ভক্ত। যেমন ধর, তোমায় সব সময় মনে রাখতে হবে তুমি যেন কোন রাজকীয় কাজ করছ। বিদেশী রাজদূতদের যেমন সব সময় মনে রাখতে হয় যে তারা দেশের প্রতিনিধি। তাই চলনে বলনে তারা প্রতি মুহূর্তে বিদেশী রাজদূত। এখানকার সকলেই কিন্তু এইভাবেই চলে। তোমায় যদি একই সন্ধ্যায় কোন একজনকে তুশ আটত্রিশ বার সম্বোধন করে কথা বলতে হয়, তবু প্রতিবারই পুরো টাইটেল দিয়ে কথা আরম্ভ করতে হবে।

কোন এক লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হচ্ছে গত পঞ্চাশ বছর ধরে, তবুও তোমাকে প্রতিবারই পুরো টাইটেল বলে আরম্ভ করতে হবে।

আমি কতবার যে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট শহরে বিশ্ববিখ্যাত গোয়েটের বাড়ি দেখবার জন্য গেছি। গোয়েটের লেখার ভক্ত আমি। ওখানকার গাইডের সঙ্গে বন্ধুত্বই বলতে গেলে হয়ে গেছে। কত শতবার গোয়েটের বাবার কথা আমাকে বলেছে। প্রতিবারই তার সম্বন্ধে হের রাট, মিস্টার কাউনসিলার বলে আরম্ভ করেছে। আমার সঙ্গে গাইডের এতদিনকার চেনা, গোয়েটের বাবাও তুশ বৎসরের উপর মারা গেছেন। কিন্তু একবারও বলতে শুনলাম না শুধু 'তিনি' বলে। অতএব এই দেশে সব সময় নিজেকে রাজদূত মনে করবে।

এই গল্প শুনে আমাদের তিনজনের তো হেসে হেসে প্রায় পেটে খিল ধরে যাবার দাখিল। মনে হোল দিনটা ভালই কাটল। বিশেষ করে —সব ভাল যার শেষ ভাল হওয়াতে।

॥ তের ॥

সকালে উঠেই তিনজনের শহরের বাইরে যাবার ইচ্ছে। শহরের কিছুটা দেখা হয়েছে। একটা বেশ ধারণা হয়েছে। তাই মনে হোল অন্য কোন দিকে যাই, অন্য কিছু করি।

বেরিয়ে পড়লাম আলটো মুনস্টারের দিকে। উনিশ মাইল দূরে। বাসে করে যেতে যেতে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দেখতে খুব ভাল লাগছিল। আমাদের দেশে যেমন শহরের বাইরে গেলে ধানের বা গমের ক্ষেত। চোখ জুড়িয়ে যায়। এদেশে তেমনি আঙুরের বাগান। বিয়ার বাগানের ছড়াছড়ি।

এখানকার হাওয়া, জল, মাটি উত্তরের চাইতে আলাদা। প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেক বেশী সুন্দর, মন ভোলানো। উত্তর জার্মানীও সুন্দর; তবে এর কাছে কিছু নয়। লোকেরাও একটু হ্যাপি গো লাকি ধরনের।

দক্ষিণ দিক, দক্ষিণ হাওয়া, সবের মধ্যেই আছে একটা গা এলাবার আমেজ। তাই ত কবি গেয়েছেন :

"ওগো দক্ষিণ হাওয়া,
ও পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।"

এদেশেও তাই দেখলাম। প্রকৃতিও এদিকটায় উজাড় করে ঢেলে দিয়েছি আনন্দের উপকরণ।

চারিদিকে বিয়ারের বাগান দেখে মনে হচ্ছিল এইত উপকরণ যা এদের মনে দোলা লাগায়। মাঠে, ঘাটে কোন কিছুর উপলক্ষ পড়লেই এদিককার ছেলেমেয়েরা তাদের নিজস্ব জাতীয় পোশাক পরে জাতীয় নাচ নাচে। শুনে মনে হোল কি অপূর্বই না লাগে তখন।

আমরা ওখানে দেখলাম ওখানকার তেরশতকের রোমানেস্ক স্টাইলের গির্জা। তারপর মিউনিকের পথে আসতে পড়ল ফ্রেইসিং। এই

জায়গা এক সময় মিউনিকের আর্কবিশপের রাজধানী ছিল। এখানে অনেক কটি গির্জা রয়েছে। থাকাটা স্বাভাবিক।

তাছাড়া দেখলাম একটা ছোট মিউজিয়াম ও বিশপের প্রাসাদ। সবই বেশ অনেক দিনের পুরোন। কিন্তু বড় যত্নে রাখা।

পশ্চিমের এই জিনিসটা আমাকে বড় মুগ্ধ করেছে। পুরোন দিনের মঠ এখন কৃষি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। মঠে সন্ন্যাসীরা বিয়ার বানানোর ব্যবসা শুরু করেন হাজার চল্লিশ সালে। এখন অবশ্য এই বিয়ার বানাবার কারখানা সরকারের দ্বারা চালিত।

সন্ন্যাসীরা বিয়ার বানাতেন জেনে কিন্তু নাক সিট্‌কাবেন না। আমাদের পুরাকালের শাস্ত্র যদি ঘেঁটে দেখেন তবে দেখবেন এখন যে সব আমরা নিষিদ্ধ খাবার আর পানীয় ভাবি তখনকার দিনের সাধুরা সেগুলি খেতেন ও পান করতেন। এবং তার সঙ্গে ধর্ম চর্চাও করতেন। এমন সব ধর্মের বই লিখে গেছেন যা যুগ যুগান্তর পরেও সারা বিশ্বের কাছে বরণীয়। আমাদের কাছে ত অবশ্যই। সে সব শাস্ত্র সামনে ধরে পৃথিবীর চোখে পিছিয়ে পড়া ভারতও জগৎসভায় সম্মানের আসন পায়।

ওখান থেকে গেলাম শ্লেসহাইমে। তিনটি পুরোন দুর্গের জন্য এই জায়গাটার খুব নাম। ইলেক্টার অর্থাৎ রাজা ম্যাক্সিমিলিয়ান এগুলি বানিয়ে ছিলেন। গত মহাযুদ্ধে সবই ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। এখানে বিশেষ করে কোচ থামল যাত্রীদের দুপুরের খাবার সুবিধের জন্য। ঐ ভাঙা দুর্গই রেস্টুরেন্ট মালিক এত সুন্দরভাবে নতুন সাজে করে নিয়েছে যে সেখানে খেতে বেশ ভালই লাগল। ভাল খাবারের জন্যই নয় শুধু, এর অভিনবত্বের জন্য। পুরোনর মাঝে নূতন। খেতে খেতে মনে এলো অতুল প্রসাদের গানটি :

"কে আবার বাজায় বাঁশী
এ ভাঙা কুঞ্জ বনে।"

সত্যই তাই। খাবার পরে আমরা একটু হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। কোচ ছাড়বার দেরি ছিল। বাবা ও মেয়ে গল্প করতে করতে একটু

এগিয়ে গিয়েছিল। একা হাঁটতে হাঁটতে একটা কথা মনে ধাক্কা দিচ্ছিল। এতবড় দেশ, এত বড় জাত। বারে বারেই কেন ভুল করে ? দুই মহাযুদ্ধই এরা শুরু করে এবং প্রতিবারই এরা ধ্বংসের পথে যায়। অবশ্য আবার উঠে দাঁড়ায় বা দাঁড়িয়েছে।

কত মাথা এদের। সব দিক দিয়ে এত মাথা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে আর কোন জাতের নেই। তা সত্ত্বেও কেন এই মারাত্মক ভুল ?

অনেক গুণের মধ্যে ওদের একটা নির্গুণ রয়েছে। সব সবাইকে জানতেই হবে বা সবাই সব জানে। যেমন ধরুন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন তার মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুন্দর, কর্মঠ আর কেউ নেই। যদিও এই রকম ভাবাটাই ত মাথার ছিটের লক্ষণ। সেই রকম আত্মসচেতন, আত্মম্ভরী লোকেরাও এক হিসাবে ছিটগ্রস্ত।

রেলের সময়ের সব খবর না জানাটাই লোকে স্বাভাবিক মনে করবে সবজান্তা হয়েও। এখানকার লোকেরা তা করবে না। এখানে দু'জনের বোধ হয় রেলের সময় নিয়ে হাতাহাতির দাখিল হয়ে যাবে কিন্তু কেউ কারও মত এক ইঞ্চিও ছাড়বে না। এমনকি একটু যে বইটা খুলে দেখে নেবে তাও করবে না। সেটাতে তাদের অপমান। যাক প্রাণ, থাক মান।

আত্মবিশ্বাস খুবই বড় গুণ। কিন্তু যদি সীমা ছাড়িয়ে যায় তবে বিপদ আসতে পারে।

আবোল তাবোল সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আপন মনে অনেকটা দূরে এসে পড়েছিলাম ; হঠাৎ মেয়ের ডাকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ছুটে ছুটে আসছে।

"শিগ্‌গির্ এসো, কোচ ছাড়বার সময় হয়ে গেছে।"

আমি পা চালিয়ে ফিরে আসতে আসতে মেয়ে ধরে ফেলল। "মা, তুমি কি যে কর ? আপন মনে কোন দিক দিয়ে গেছ আমরা দেখতে পাইনি। আমারই দোষ, একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তাই কথা বলছিলাম। সেই অবসরে তুমি পগার-পার।"

তিনজন কোচে চড়তেই কোচ ছেড়ে দিল। বুঝলাম আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল।

বড় লজ্জা পেলাম। পরের দোষ ধরতে গেলে বোধ হয় এই হয়।

এবার আমরা ডাচাউ নামে একটি ছোট পুরোন জায়গাতে এসে পড়লাম। ভারি সুন্দর মিষ্টি জায়গা। প্রকৃতি এখানে বড় সুন্দররূপে, সুন্দর সাজে সেজেছে। মন যেন হারিয়ে গেল এই রূপের ছোঁয়ায়। কিন্তু যাদের মন বলে কোন পদার্থ নেই তাদের ত সে দুর্বলতা আসবে না।

তাই এইখানেই গত যুদ্ধের সময় নাৎসীদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তৈরি হয়েছিল এবং এইখানেই লক্ষ লক্ষ লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল।

মানুষ এক আজব জীব। তাঁর এক আজব সৃষ্টি। কেউ স্বর্গের ফুল, কেউ নরকের কীট।

খুব ঘুরে ফিরে হয়রান হয়ে এসে তিনজনে নামলাম মিউনিক শহরে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেছে। চারিদিক বিজলীর ছটায় দিনকে হার মানায়। এই আলোর খেলা দেখেই বোধ হয় গুরুদেব লিখেছিলেন, "আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও।" সত্যিই তাই। এই আলোর ছটা মনটাকে আনন্দে ভরে দেয়।

এই ঝলমলে শহরে এসে শরীরের ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে গেল।

এখানে পৃথিবীর নানা দিক থেকে লোক আসে কাজ করতে। তাছাড়া এদেশবাসীরাও ছুটি কাটাতে বিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই দেশ বিদেশের রান্নায় কিছু অভ্যস্ত হয়। স্বাদ পায় নানা রসের।

সেই সুযোগ নিয়ে এখানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশের রেস্টুরেন্ট। রাশিয়ান, চাইনিজ, স্প্যানিশ, হাঙ্গেরিয়ান, টার্কিশ, ইটালিয়ান ইত্যাদি।

আমরা গিয়ে ঢুকলাম স্প্যানিশ রেস্টুরেন্টে। লণ্ডন ছাড়বার আগে একবার ত নিশ্চয়ই সেই দেশে যাব। বিশেষ করে মাড্রিডের আর্ট মিউজিয়াম প্রাদোতে গোইয়ার পেইনটিংস দেখবার জন্য। তাই এই উৎসাহ।

রান্নাও ত সত্যি কথা বলতে এক রকম শিল্প; অন্যটা যখন পাচ্ছি না তখন দুধের সাধ ঘোলে মেটান যাক।

মাংসের স্টেক শৃম্প উইথ গারলিক অর্থাৎ রশুন সমেত গলদা চিংড়ী ত নিলামই। তাছাড়া আরও এটা সেটা। সঙ্গে জলের মত হাল্কা স্প্যানিশ ওয়াইন। স্পেনের আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য রেস্টুরেন্টে বাজছিল ফ্ল্যামেংকো বাজনার গীটার। এখানে খেতে খেতে মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি সেই দেশেই চলে গেছি। হবে নাই বা কেন। কথা ত আছেই "ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনম্।"

আমাদের তিনজনেরই খুব ভাল লাগছিল।

মেয়ে বলল, "দি আইডিয়া। সত্যি মা তুমি লেখ না কেন? তোমার মাথায় এতরকম আইডিয়া আসে। লিখলে তুমি খুব ভাল লিখবে।"

মনে আছে, বলেছিলাম, "ঠাট্টা করিস না। কে জানে লিখতেও ত আরম্ভ করতে পারি।"

আজ লিখতে লিখতে সে কথা মনে হচ্ছে। সত্যি মানুষের ভবিষ্যতে কি আছে কেউ জানে না।

এখানে কত যে নাইট ক্লাব আছে তার কোন ঠিক নেই। বেশীর ভাগই অবশ্য ভরা থাকে টুরিস্টদের দিয়ে। ছুটি কাটাতে ও পয়সা ওড়াতে সবাই আসে দূরদূরান্ত থেকে। টুরিস্টরা লোটে আনন্দ আর মিউনিকবাসীরা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে ও পয়সা নেয়, পকেট ভরে।

আমরা একটাতেই গিয়েছিলাম। হোটেল হলিডে ইন-এ। এটা বানিয়েছে জলের নিচে। একটা স্টীল ট্যাঙ্কের মধ্যে মোটা কাঁচের তৈরি একটা ঘরের মধ্যে হচ্ছে রেস্টুরেন্ট। নাচ, গান, খাওয়া, সব চলছে। এই স্টীলের তৈরি পুকুরে আছে চল্লিশটা হাঙর। কাঁচের ঘরের মধ্যে বসে আর সব কিছুর সঙ্গে বসে বসে দেখা যায় এদের।

কেন জানি, আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। একটুক্ষণের মধ্যেই উঠে পড়লাম একগাদা টাকা গচ্চা দিয়ে আর হায় হায় করতে করতে। বাকী দুজনেরও সেই অবস্থা।

মেয়ে ত প্রায় চোখের জল ফেলে বলেই ফেলল, "আহারে, এই টাকা দিয়ে কত কিছু দিন ছনিয়া করা যেত।"

"এতে কোন রাজত্বই কেনা যেত না, বুঝলি? একটা উপকার হোল, নিজের মনের ধারাটা চেনা গেল।"

পরের দিন সকালে উঠে রওনা হলাম মিউজিয়াম দ্বীপ ও ম্যাক্সিমিলিয়ান স্ট্রীটের দিকে।

ডয়েটচে মিউজিয়ামে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। যাকে বলে "চক্ষু চড়ক গাছ"। এ এক বিরাট ব্যাপার। এটা হচ্ছে ন্যাচারল সায়েন্স ও টেকনলজির মিউজিয়াম। পৃথিবীর মধ্যে বলতে গেলে সব চাইতে বড় মিউজিয়াম। এই বিষয়ের অবশ্যই।

এটা বানিয়েছিলেন জারম্যান ইন্জিনিয়ার অস্কার ভন মিলার উনিশশ তিন সালে। পৃথিবীতে ইন্ডাসট্রি কি করে গড়ে উঠেছে তার ইতিবৃত্ত এখানে পাওয়া যায় নানা ধরনের মডেলের মাধ্যমে।

তাছাড়া এখানে আছে ৪০০,০০০ বিজ্ঞানের বই। তেরশ সাইনটিফিক্ ম্যাগাজিন এখানে সাবস্ক্রাইব করা হয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পাওয়া যায় সাহিত্য, বিজ্ঞান পেইন্টিং-এ, মানে সব দিকেই যারা নামী সেই পুরাকাল থেকে রেনেসাঁস পর্যন্ত তাদের সকলের ছবি। আঁকা রয়েছে ফ্রেস্কো পেইন্টিংএ।

ওখান থেকে একটু এগিয়ে আমরা গেলাম ব্যাভেরিয়ান পারলিয়ামেন্ট দি ম্যাক্সিমিলিয়ানিয়াম দেখতে। এটা বানানো হয়েছিল একশ বছর আগে, ব্যাভেরিয়ার রাজা দ্বিতীয় ম্যাক্সিমিলিয়ানের জন্য।

এখান থেকে আমরা ইজার নদী পেরিয়ে গেলাম ম্যাক্সিমিলিয়ান ব্রীজ দিয়ে। পড়লাম গিয়ে ম্যাক্সিমিলিয়ান স্ট্রাসে বা স্ট্রীটে। সেখানে দেখলাম দ্বিতীয় ম্যাক্সিমিলিয়ানের ব্রোঞ্জের মূর্তি। এদিককার আঠার শতক থেকে উনিশ শতকে তৈরি অনেক দেখবার মত স্থাপত্য গত মহাযুদ্ধে শেষ হয়ে গেছে। তবে কিছু কিছু এরা আগের মত অবিকল গড়ে তুলেছে বা গড়ছে।

এদের উৎসাহ অদম্য। এরা কোন কিছুতেই আমাদের মত ভেঙে

পড়ে না। এরা বোঝে মানুষই যদি নশ্বর তবে মানুষের গড়া জিনিসকে অবিনশ্বর কেন ভাবব।

জন্ম, মৃত্যু দুদিকেরই দরজা যখন মানুষের জন্য খোলা রয়েছে, কেন তবে মানুষের তৈরি জিনিসের বেলায় তা হবে না? এই কথাটা তারা উপলব্ধি নিশ্চয়ই করে। তাই গড়ার পরে ভাঙা, ভাঙার পরে গড়া, কোনটাই তাদের তেমন বিচলিত করে না।

এখান থেকে যাওয়া হোল দি রেসিডেনসিতে। এটা হোল অনেক-গুলো রাজপ্রাসাদের সমষ্টি। কাছাকাছি বেশ কয়েকটা রাজপ্রাসাদ ছিল প্রথম ডিউকদের জন্য। তারপর এখানকার ইলেকটার বা রাজাদের জন্য। এর ভেতরকার স্থাপত্য, আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, সব মিলিয়ে ইউরোপের একটা বিশেষ চারু শিল্পসম্মত সুরুচিসম্পন্ন অমূল্য জিনিস ছিল। তখনকার কালের নানা স্টাইলের স্থাপত্যের সমন্বয়।

গত মহাযুদ্ধে এসব ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গে এরা নূতন উদ্যমে লেগে গেছে আবার সেটা নিখুঁতভাবে আগের মত গড়ে তুলতে। যতটা তৈরি হয়েছে সেখানে সরাবার মত জিনিস-গুলো লুকোন জায়গা থেকে এনে এক এক করে বসান হয়েছে।

উনিশশ আটান্নতে মিউনিক শহরের আটশত জন্ম শতবার্ষিকীতে পঞ্চাশটা বড় বড় ঘর আগের মত অবস্থায় জনসাধারণকে দেখবার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা গিয়ে সব দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

সব চাইতে যা তৃপ্তি দিল, তা এদের দেশপ্রেম। নিজেদের গর্ব করবার যা কিছু, যত পুরোনই হোক, তার জন্য আবার যত খরচই করতে হোক, তা তারা করবে। নিজের দেশ সব কিছুর ওপরে তা এরা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছে। তাই ত এরা এত বড়।

জানিনা, আমাদের দেশের লোক কবে সেটা উপলব্ধি করবে।

যদিও এই দেশেই প্রথম যে সব বই লেখা হয়, এখনও যা বিশ্ব পূজ্য, তাতে আমাদেরই দেশের মহামানবরা লিখেছিলেন,

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

আবার কবে আমার সেই দেশ হবে। মানুষ সেইরকম উপলব্ধি করবে।

এখানকার সব চাইতে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে সেণ্ট জর্জের মূর্তি। এর গায়ে রয়েছে দু হাজার দুশ একানব্বইটা হীরে, দুশ নটা মুক্তো ও চারশ ছয়টা চুনী।

শুনেই ত মাথা ঘুরে যায়।

মনে করিয়ে দেয় দক্ষিণ ভারতের কথা। দিল্লি থেকে সে যখন টুরে গিয়েছিল তখন আমি ও মেয়ে সঙ্গে ছিলাম। মেয়ে তখন বেশ ছোট। পরের বছর স্কুলে ভর্তি হবে। কোন পিছু টান নেই। ওখানে দেখেছি সব মন্দিরের মূর্তির গয়না। তখন অবশ্য বেশীর ভাগ মন্দিরই কোর্ট অব ওয়ার্ডস মানে সরকারের হাতে। লক্ষ লক্ষ টাকার, বোধ হয় কম করে বলা হয়ে গেল, নিশ্চয়ই মনে হয় কোটি কোটি টাকার হীরে মুক্তোর গয়না সব সরকার থেকে ট্রেজারীতে রাখা ছিল।

দিল্লীর কর্তাদের ব্যবস্থায় আমাদের দেখাবার জন্য সব বের করে সাজিয়ে দিয়েছিল। দেখে চোখ ঝলসে গেল। মনে হল কলকাতার সব গয়নার দোকানের গয়না একসঙ্গে করলেও এর সঙ্গে তুলনা হবে না। বোধ হয় বম্বের সব একসঙ্গে করলেও হবে না। কত যুগ ধরে এখানে জমা হয়েছে।

গেলাম ব্যাভেরিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার, দি ম্যাক্স জোসেফ প্লাটজ দেখতে। এটাও বোমার আঘাতে অনেকটা ভেঙে যায়। আবার গড়ে তুলেছে। এটাই হচ্ছে ব্যাভেরিয়া স্টেটের অপেরার প্রাণকেন্দ্র। মনে হয় ইউরোপের মধ্যে এটাই সব চাইতে সুন্দর ও বড় অপেরা হাউস।

রাত এসে মিশে গেছে দিনের শেষের দিকে, সন্ধ্যার সঙ্গে। সেই মেলামেশার সময়টা উতরে গেছে অনেকক্ষণ।

খিদেও পেয়ে গিয়েছিল প্রচণ্ড। তাই দেরি না করে ঢুকলাম গিয়ে একটা ছিমছাম ছোট সস্তা খাবার জায়গায়। নিলাম রোল, সসেজ ও হাল্কা ওয়াইন। আজ আমরা সাবধান। গত রাতে বেমক্কায় অনেকগুলো পয়সা বেরিয়ে গেছে। তাই ঠিক ছিল পেট ভরে স্বাস্থ্যকর খাবার খাব, কিন্তু সাদাসিদে। শেষে কফি উইথ ক্রীম নিলাম। হোটেলে ফিরে ঘোমটা পরা ঘুমের দেশে দিলেম পাড়ি।

॥ চৌদ্দ ॥

সকালে ঘুম ভাঙল নাকি সুরে ইংরেজী কথা শুনতে শুনতে।

বুঝলাম বেশ কিছু আমেরিকাবাসী ও বাসিনীর আগমন হয়েছে হোটেলে।

এরা কথা বলে বেশ চড়া সুরে। চলে বেশ হেলে দুলে, নেচে চলার ভঙ্গীতে। এত লম্বা চওড়া এরা, কিন্তু চলার স্টাইল দেখলে মনে হয় গায়ে এক ছিটে জোর নেই। হাত পা ছাড়া প্যাটার্ন।

ভুল করে এগিয়ে গিয়ে আবার জোর দেখাবেন না। একখানা চাপড়েই ধরাশায়ী করতে পারে।

যাক বাজে গুলতানি। বেশী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নতুন আগমনকারীদের মনে মনে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ে বাথরুমে যাবার আগে দুজনকে দিলাম ঘুম ভাঙিয়ে।

ওদের সত্যিকারের ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে চান সেরে বেরিয়ে পড়তে পারব। যা ভেবেছিলাম তাই। অকাতরে আবার ঘুমোচ্ছে দুজনে।

ঘরের রিং-এর জল গরম করে তিন কাপ কফি বানিয়ে দু কাপ দুজনের হাতে ধরিয়ে দিলাম।

ঘুম তাড়াবার এ এক মহৌষধ। গলায় এক ঢোক পড়লেই ব্যস। আর কিছু লাগবে না।

মেয়ে উঠে গেল রেডি হতে। তারপর যাবে বাবা। একটা এটাচড্ বাথরুম। থ্রি ইন্ ওয়ান যাকে বলা যায়। একটাতেই তিনজনের কাজ সারতে হবে।

বাইরে বেরিয়েই প্রথম সকালের খাবার পেট ভরে খেলাম।

চললাম লাডউইগ স্ট্রাসে মানে স্ট্রীটে। এর চৌমাথায় আছে প্রথম লাডউইগের অপূর্ব সুন্দর মূর্তি। নামটা ত লেখাই আছে। তার সঙ্গে

লেখা আছে ওঁর আদর্শবাণী—"I wish to make of Munich a city that will be of such honour to Germany, that no one will be able to know Germany without having seen Munich." এই ছিল তাঁর মনের কথা।

উনি সত্যিই মিউনিককে নিজের সন্তানের মত ভালবেসে ছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল। মিউনিক গড়ে উঠেছিল এক অপূর্ব শহর হিসাবে। তিনি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা যতদূর সম্ভব সামান্যভাবে থেকে সব ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছিলেন মিউনিকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য।

স্থপতি লিও ভন ক্লেনৎসে ও রাজা নিজে দিনরাত্র প্ল্যানিং করতেন। বিরাট বিরাট ব্যাপার তিনি গড়ে তুলেছিলেন নিজের তহবিল থেকে তিরিশ মিলিয়ন ডলার খরচ করে।

মৃত্যুর সময় তাঁর নিজের টাকায় যে সব বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছিল, সব ব্যাভেরিয়ান স্টেটকে ও মিউনিক শহরকে দান করে যান।

তারপরেও যেসব রাজা এসে গেছেন বা প্রেসিডেন্ট এসেছেন তাঁরা এই দিক দিয়ে তাঁর আদর্শ সামনে রেখে চলেছেন।

স্মৃতিস্তম্ভ, প্রাসাদ, বড় বড় স্কুল, মিউজিয়াম, বিজ্ঞানের ইনস্টিটিউশন ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। সুন্দর পথঘাট। রূপসী মিউনিক নানা দেশের কবি, লেখক, আর্টিস্টকে মুগ্ধ করে নিয়ে এসেছে তার কাছে। তাই গত শতাব্দীতে মিউনিক হয়েছিল ইউরোপের কালচারের মধ্যমণি।

এই রাস্তার ওপরই পাই ব্যাভেরিয়ান স্টেটের লাইব্রেরী, এখানকার ইউনিভারসিটি একাডেমী অব ফাইন আর্টস্‌ও এর কাছে পিঠে।

এই সুন্দরী মিউনিক শহর আমাকেও মুগ্ধ করেছে। মানুষের সৃষ্টি কি সুন্দর। সেই একই মাটি একই সব। তবে আমার পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের বা আমার দেশের কর্তা ব্যক্তিদের কেন এই ভালবাসা হয় না? কেন তারা এই দেশটাকে ছন্নছাড়া করে রেখেছে? সবাই যা পারে, আমরা কেন তা' পারি না? আমরা মুখে মানুষ মানুষ চেঁচাই। কেন জানি কেউ বুঝতে চায় না বা বোঝে না যে মানুষের আগে দেশ। যেমন সন্তানের আগে মা। স্বাস্থ্যহীন মায়ের সন্তান কখনও মনে ও

দেহে সুস্থ হতে পারে না। তাকে পরে যতই না যত্ন কর। সেই রকম রুগ্ন দেশে, যে দেশ খোলামেলা নয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুষ্ঠুভাবে যে দেশ রাখা নয়, সেই দেশের মানুষ ত মানুষ হবে না। দু'হাত দু'পাওয়ালা জীব হবে।

এসব আমি ভাবতে চাই না। বিশেষ করে এখন। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে যেখানে যা ভাল সব মনের মণিকোঠায় ভরে নিয়ে যেতে চাই। যদি কখনো দেশের কোন কাজে লাগে।

এরপরে গেলাম শোয়াবিংএ। আর্টিস্টরা ও ছাত্ররা এখানে থাকে। এখানে দেখলাম আর্ক অব ভিক্টরি প্রথম রাজা লুডভিগের সময়ে তৈরি। অন্য সব দেশের আর্টিস্টদের কলোনী হয় পুরোন শহর। ছোট ছোট সরু রাস্তা ও অলিগলি ও পুরোন বাড়িঘর নিয়ে। এখানে কিন্তু আর্টিস্ট কলোনী তা নয়। মডার্ন, সুন্দর, এই শতকেরই বানানো। থাকবার বাড়িগুলোও ভারি সুন্দর।

এখানে ঢুকলেই বেশ আর্টিস্টদের আবহাওয়া পাওয়া যায়। প্রাণ চঞ্চল রেস্তোরাঁ, বাইরে থেকে গুহার মত তৈরি নাইট ক্লাব। দাড়িওয়ালা আর্টিস্টরা সত্যিকারের আর্টিস্ট নয়, তবু ভাবভঙ্গিটা ওরকম করে তাদের দলে ভিড়ে যাবার চেষ্টা করছে—এ সবই এখানে আছে।

তাছাড়া, আরও একটা ব্যাপার দেখলাম। শীতের মাসগুলো ছাড়া বাকি সময়ে ওখানকার আর্টিস্টরা তাদের হাতের কাজ থেকে আরম্ভ করে পেইন্টিংস পর্যন্ত এমনকি কবিতা লিখে সেইসব জিনিস বা পাতলা চটি বই নিয়ে বিক্রির জন্য ফুটপাথে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। বিদেশীদের বা স্বদেশীদের দেখবার ও কিনবার জন্য। তোমরা যদি কিছু না-ও কেন তবুও বিয়ারের জন্য তোমাদের একটা কয়েন দিতে হবে—এইজন্য রাখা প্লেটের উপরে।

এই রাস্তাটা সত্যিই সন্ধ্যাবেলা ভারি সুন্দর লাগে। সকলে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়। এ যেন মনে হয় মিউনিক শহর নয়। অন্য কোন দেশ, অন্য কোন জায়গা।

অথচ ফুটপাথে ছড়ান ছিটান দোকান বা জিনিস তো কলকাতারও

সর্বত্র। কিন্তু কেমন খারাপ লাগে। বিদেশীরা এসে কত বাজে মনে করে।

এখানে একটা রাস্তায় একরকম সুন্দর জিনিস সুন্দর করে রাখা মোমবাতি জ্বালিয়ে। চোখ জুড়িয়ে গেল। নতুনরূপে মিউনিক ধরা দিল।

দি হাউসট্ ডার কুন্স্ট অর্থাৎ কলা ভবনে দেখলাম উনিশ ও বিশ শতকের জার্মান আর্ট। ফ্রান্সেরও অবশ্য আছে। এখানে সারা বৎসরই কোন না কোন প্রদর্শনী চলে।

তারপরে দেখলাম ব্যাভেরিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়াম। এতে কি নেই? আর্ট, স্থাপত্য, বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলা, পুরাকালের অস্ত্রশস্ত্র থেকে আরম্ভ করে কাঠের তৈরি পুরোন দিনের জিনিস ও আগের কালের সিল্কের কারুকার্য করা কাপড় ইত্যাদি। এই মিউজিয়ামে এলে আগের দিনের এই দেশ সম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা হয়।

এই যা, ভুলে গেছি, দুপুরের খাওয়ার কথা কিছু লিখিনি। আপনারা বোধ হয় ভাবছেন, দুপুরে খেয়েছ, বেশ করেছ, সবাই খেয়ে থাকে। তা এত জাঁক করে সবাইকে জানাবার কি আছে?

আছে বলেই ত বলছি। আপনারা কেউ কি গুহার মধ্যে খেয়েছেন?

আমরা আর্টিস্ট কলোনিতে গুহার মধ্যে বসে দুপুরের খাবার খেলাম। এমনভাবে তৈরি করেছে যে মনে হয় সত্যিকারের একটা গুহা। ভেতরটা আধো আলো, আধো অন্ধকার। বেশীর ভাগই জোড়ায় জোড়ায় বসা। বোহেমিয়ান ভাবভঙ্গি।

"আমাদের তিনজনকে কেমন বেখাপ্পা বেখাপ্পা লাগছে না এখানে?"

"তা কেন? আমরাই ত বলতে গেলে একটু রং এনে দিলাম। সবই ত একধারা, আমরাই নূতনত্ব সৃষ্টি করলাম।"

"কথাটা মন্দ বলিসনি অনু। এখন মনে একটু জোর পেলাম। জুত করে বসা যাক।"

সে বলল, "ভারী সুন্দর কথা বলেছে অনু।"

তিনজনে নানা রংঢং দেখতে দেখতে খাওয়া হোল। পৃথিবীর

মধ্যে বিখ্যাত আর্ট গ্যালারী অলটে পিনাকোথেকে গেলাম। রাজা প্রথম লাডউইগের সময়ে বানান। এ যেন এক রাজপ্রাসাদ।

অল্‌টে মানে পুরোন। পিনাকোথেকে হচ্ছে পেইন্‌টিং গ্যালারী। এই নাম দেওয়া হয়েছিল, কারণ এখানে রাখা হয়েছে চোদ্দ শতক থেকে আঠার শতকের যত নাম করা পেইন্‌টিং। সাত হাজার ছবি আছে এখানে।

পৃথিবীর আর কোথাও রুবেন্সের আঁকা এত ছবি নেই। তাছাড়া আছে রেমব্রান্ট, ভ্যান ডাইক, র‍্যাফায়েলের হোলী ফ্যামিলি, লিওনার্দো দা ভিন্‌চির ম্যাডোনা উইথ চাইল্ড, টিসিয়ানের সম্রাট পঞ্চম চার্লস। তাছাড়া টিনটোরেট্টো মুারিলো, গোইয়া ইত্যাদি ইত্যাদির। এ এক অপূর্ব সঙ্কলন।

যে দিকে তাকাই সেদিকেই চোখ আটকে যায়। মনে হয়, দিনের পর দিন শুধু এসব দেখে কাটিয়ে দেওয়া যায়। আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই জীবনে।

কিন্তু উপায় নেই। বেরিয়ে পড়তে হোল। মনটা রইল পড়ে। পৃথিবীতে সত্যি ভাববার, বসবার সময় নেই। শুধু চলতে হবে।

মনে পড়ে, ছোটবেলায় পরীক্ষার আগে গুরুদেবের কবিতার বইগুলো চাবি দিয়ে রাখতাম। এর মোহের মধ্যে পড়ে গেলে পরীক্ষার চিন্তা শিকেয় উঠবে।

বিয়ের পরে দেখেছি, এ এমন এক আকর্ষণ যে এর মধ্যে পড়ে গেলে সংসার বা কর্তব্য সব গোলমাল হয়ে যায়।

এই বিরাট প্রাসাদ গত যুদ্ধের বোমার আঘাতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা নিখুঁতভাবে ঠিক আগের মত তৈরি ক'রে উনিশশ' সাতান্নতে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

যে জায়গাতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আনন্দ উৎসব হয় সেইখানে গেলাম। সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে থারেসিয়েনউইজ। এই জায়গাটা শহরের চাইতে অনেকটা উঁচুতে।

ওখানে ব্যাভেরিয়ার মূর্তি আছে। আটানব্বই ফুট উঁচু সেই মূর্তির মাথায় উঠলাম একশ তিরিশটা সিঁড়ি বেয়ে।

আমরা গিয়েছিলাম গরমকাল পেরিয়ে। তাই ওঠা সম্ভব হোল। মূর্তিটা ব্রোঞ্জের তৈরি, তাই গরমের সময় ভেতরটা বড় গরম হয়ে যায়।

উঠতে উঠতে দিল্লির কুতুবমিনারের কথা মনে হচ্ছিল। কতবার উঠেছি তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। মনে হয় মানুষের সব সময়ই আকাশের দিকে যাবার আকাঙ্ক্ষা। অজানাকে জানার ইচ্ছা। যখন চাঁদে পৌঁছান হয়নি, তখনও সকলে উপরের দিকে ধাওয়া করেছে মনের অজান্তে।

তাই অতীতের উঁচু উঁচু মিনার বা চূড়া দেখা যায়। যদিও তখন মানুষের সংখ্যা ছিল কম। জায়গার কোন অভাব ছিল না।

সেখান থেকে সোজা চলে গেলাম স্কল্স নিমফেনবার্গ প্রাসাদ দেখতে। এটা ছিল ব্যাভেরিয়ার রাজাদের গ্রীষ্ম-নিবাস। এটা তৈরি আরম্ভ সতের শতকে ও এখন যা আমরা দেখি তা হতে একশ বৎসর লেগেছিল।

এর মধ্যে সব চাইতে ভাল লাগল কনসার্ট হলটা দেখে। এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। তখনকার দিনের রাজাদের নানা রকম ব্যবহার করবার জিনিস সুন্দর ভাবে রাখা আছে।

এর চারিদিকে যে পার্ক রয়েছে তার থেকে মন আর ফেরান যায় না। সুন্দর ঝরণা, লেক, চান করবার সুন্দর বন্দোবস্ত রয়েছে। এখানে কফি খাবার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে।

বসলাম তিনজনে মনের খুশীতে কফির মগ হাতে। বসবার কি বেশীক্ষণ জো আছে। অদ্যই শেষ রজনী।

কালকে রওনা হতে হবে এখান থেকে। এখানে এত সব সুন্দর মন খুশী হবার জিনিস যে কোনটাই না দেখে যেতে ইচ্ছে নেই। যাকে বলে অতি লোভ।

একটা কথা আছে না— অতি লোভে তাঁতী নষ্ট? তাঁতীর কি নষ্ট

হয়েছিল জানা নেই। তবে আমরা লোভের কথা ভেবেই তড়িক-ঘড়িক উঠে পড়লাম।

চললাম অলিম্পিক গ্রাউণ্ড দেখতে। ওখানে পৌঁছে সব চাইতে প্রথম যা চোখে পড়ল তা হচ্ছে ন'শ একান্ন ফুট উঁচু অলিম্পিক টাওয়ার বা অলিম্পিয়া টারম্। এইটি টি ভি টাওয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পাঁচশ সত্তর ফুট উঁচুতে আছে চারটি তলা, যাকে বলা হয় অবসারভেশন্ নেস্ট। সিংহাবলোকনের নীড়। নিচের দুটি তলা কাঁচ দিয়ে ঢাকা, উপরের দুটি সম্পূর্ণ খোলা।

এই চারটি তলার নিচেই হচ্ছে কাঁচের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা রেস্টুরেন্ট। গিয়ে ঢুকলাম সেখানে। যদিও জানি, আমাদের মত পকেটের অবস্থা যাদের তাদের এখানে খাবার যোগ্যতা নেই, তবুও লোভ সামলাতে পারলাম না। সামান্য কিছু হলেও খাব। জীবনে আবার আসতে পারব কিনা জানি না। এ থাকবে আনন্দের স্মৃতি হিসাবে। নিজে খেলার জগতে কিছু করিনি। শুধু কে কি পেল, কোন্ দেশ কটা সোনা, রুপো বা তামা পেল, সেই হিসেব-নিকেশ করেছি। মৃত্যু পর্যন্ত তাই করে যাব। কাগজে পড়ব, টি ভিতে দেখব, মুখে ফুলঝুরি ওড়াব।

কিন্তু এই এখানে স্বশরীরে আসা, দেখা ও খাওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর থেকে কেন নিজেদের বঞ্চিত করি ?

এই কথাটাই বললাম ওদের। মেয়ের আমার বরাবরই স্পোর্টিং স্পিরিটের কমতি নেই—"কিছু ভেব না, রাতে আমি কিছু খাব না— এই যে কফি খেলাম, এই যথেষ্ট। তোমরা কিছু কিছু খাবে, না হলে তোমাদের কষ্ট হবে।"

"তোকে আর মা-গিরি করতে হবে না। বুঝলি, সসেজ আর রোল খাবার পয়সা আমাদের আছে। একটা কথা তোমরা একেবারেই ভুলে গেছ। এখান থেকে কিছু সামান্য হলেও কেনবার কথা ছিল। সেই পয়সাটা খরচ করে ফেললেই হবে। জিনিস ত বোঝা। কি বল তোমরা ?"

সবাই একমত। মনের খুশীতে।

॥ পনের ॥

দেশে ত এখন পুজোর ছুটি চলছে।

হামবুর্গের ট্রেনে চেপে বারে বারে একটা কথা মনে আসছিল। সব কিছুতেই ছন্দ আছে, তাল আছে।

যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম মনে হয়েছিল, এইভাবে একটানা কি ঘুরতে পারব? কখনো ত ঠিক এইভাবে ঘুরিনি। এক জায়গাতে তোড়জোড় করে গিয়ে থেমে পড়েছি। সকাল সন্ধ্যা বেড়িয়ে এসে বাঁধা আস্তানায় ঢুকেছি।

এখন মনে হয় চলারও একটা ছন্দ আছে। সেই ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে যদি চলা যায় তবে বোধহয় অনন্তকাল ধরে চললেও ক্লান্তি আসবে না।

এই যে চলেছি দেশ থেকে দেশে। এক মুহূর্তের জন্যও ত চলছি যে তা মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক। তাই ত কবি গেয়েছেন।

"বাজিয়ে চলি পথের বাঁশী।
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি॥"

হ্যাঁ। যা বলছিলাম। চলেছি হামবুর্গে।

বাচ্চা বয়সে প্রথম যখন হামবুর্গের নাম শুনি, মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই কথাটা হামবাগ। যে বলছে সে ভুল বলছে। আর এটাও মনে হয়েছিল, সেখানকার লোকেরা নিশ্চয়ই খুব হামবাগ্।

বড় হয়ে জেনেছিলাম, নামটা হামবুর্গই বটে এবং লোকেরা মোটেই হামবাগ নয়। বলতে গেলে ঠিক উল্টো। জার্মানীর মধ্যে আয়তনে বড়। বলতে গেলে বার্লিনের পরেই হামবুর্গ।

এখানকার আবহাওয়া আন্তর্জাতিক মেজাজের। শত শত বৎসর

ধরে এরা বিশ্বের সঙ্গে করছে লেনদেনের কারবার। বিশ্বের একটা বড় বন্দর বলে গণ্য।

গত দুই মহাযুদ্ধে হামবুর্গ বিশেষ করে ধ্বংসের মুখে চলে যায়। এই জাত পড়ে থাকবার জাত নয় বলে আবার তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

এই শহরটিতে চারিদিক থেকে সমুদ্রের জল ঢুকে এসেছে বলে একে উত্তরের ভেনিস বলা হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে এর একটা আলাদা সত্তা আছে। আর আছে একটা নিজস্ব রূপ।

শুধু একদিকেই ভেনিসের মত। পাইলের উপর দাঁড়িয়ে আছে বলতে পারা যায়।

হামবুর্গ বেশী রকম ভেঙেচুরে যাওয়াতে এখানকার লোক খারাপের মধ্যেও যে ভাল আছে সেটা যেন মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছে। তাই মডার্ন স্থাপত্যবিদ্যার একটা দ্রষ্টব্য সহর হয়ে উঠেছে এই শহরটি। পশ্চিমের মধ্যেও এদিক দিয়ে একটা দেখবার ও দেখাবার শহর হয়ে উঠেছে। এই শহরের চারিদিকে জল হওয়াতে বড় বড় জাহাজ দেশ বিদেশ থেকে এসে এখানে নোঙ্গর ফেলে।

দিনের পর দিন জল দেখতে দেখতে নাবিকদের মন যায় শুকিয়ে। আনন্দ পাবার জন্য ওরা ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। তাই এই বন্দর নাইট্‌ লাইফের জন্য স্বর্গ বা নরক যা খুশী বলতে পারেন।

আমাদের মত মাছিমারা কেরানী দলভুক্তদের জন্য বোধহয় ঠিক স্বর্গ নয়। কারণ পকেট ফুটো। মধ্যপথে মানে যাদের বলা হয় মিডল ক্লাস তাদের মনটা কি সব সময় মধ্যপথের মধ্যে থাকে? বা, চায় না ওপর নিচে আনাগোনা করতে?

মানুষের মনটা যা সত্যিই স্বাধীন সেখানে কেউ কোন দিন পরাধীনতার কলঙ্ক লেপে দিতে পারেনি। তাই ত ছেঁড়া কাপড় পরেও মেয়ে রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখে।

নাবিকরা যখন দেহে ও মনে ক্ষুধা নিয়ে এসে নামে তখন পকেট থাকে তাদের পূর্ণ। তাই তারা সোজা চলে যায় সেণ্ট পলি কোয়ার্টারে। এখানে রাতটা হয়ে থাকে দিনের মত। নিয়নের আলো মনে হয়

সূর্যদেবকেও হার মানায়। নাইট ক্লাবের ছড়াছড়ি। মদের ফোয়ারা নয়, মনে হয় মদের সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে। আর সেখানে নেমে আসে উর্বশী, মেনকা ইত্যাদি ইন্দ্রদেবের রাজসভা থেকে। রূপসীরা নেমে আসে মর্ত্যের আনন্দে। সবাই বলেছিল, ও পাড়াতে যেত। ভয়ের কিছু নেই। অঘটন ওখানে কোনদিনই ঘটে না। মারামারি, খুনোখুনি নেই। শুধু "বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে

কোর না বিড়ম্বিত তারে।"

এখানে পৌঁছে প্রথমেই আস্তানার বন্দোবস্ত করতে গেলাম টুরিস্ট অফিসে। দুরাত ত নিশ্চয়ই কাটাতে হবেই। হোটেলকে ফাঁকি দিয়ে যে দেখে যাবো তার সুযোগ নেই। বিরাট শহর, অনেক কিছু দেখবার। তাছাড়া কাছে পিঠেও দ্রষ্টব্য রয়েছে। তাই বাসস্থান চাইলাম।

বরাবরই চেয়েছি হোটেলে না থেকে কোন পরিবারের সঙ্গে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে। অল্প সময়ের মধ্যে এটাই হচ্ছে সবচাইতে সহজ উপায় মানুষকে জানবার। তাছাড়া বোধহয় খরচও একটু কম।

যাইহোক, জোর কপাল, পেয়ে গেলাম মনের মত আস্তানা। শুধু বেড আর মর্নিং কফি। গিয়ে উঠলাম সেখানে। স্বামী অফিসে চলে গেছে। সুন্দরী অল্প বয়সী স্ত্রী ও একটা ছ সাত বৎসরের ছেলে। আমরা যখন গেলাম, ছেলেও স্কুলে।

মেয়েটিই লিখছি, কারণ তার বয়স পঁচিশ তিরিশের বেশী হবে না। দরজা খুলে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেলাম। ভারী সুন্দর মিষ্টি দেখতে। এসব দেশে এত ঘুরছি, এমন মুখটি ত চোখে পড়েনি। কি নমনীয় কমনীয় চেহারা। বিশেষ করে জার্মানরা সুন্দর অসুন্দর বেশীর ভাগই বেশ জবরদস্ত চেহারা। এ যেন সেই শ্রেণী ছাড়া চেহারা। মনে হোল, আমাদের দেশের সুন্দরী ভুলে এসে এখানে জন্মেছে।

সে ইংরেজী বিশেষ বলতে পারে না। বুঝতে পারে। হাবেভাবেই সব হয়ে গেল। তিনজনকে একটা শোবার ঘরে নিয়ে গেল ও, বাথরুম দেখিয়ে দিল। আমরা হাতমুখ ধুয়ে রেডী হয়ে পড়েছি বেরোবার জন্য।

এমন সময় ট্রে হাতে এসে ঢুকল। কফির মিষ্টি গন্ধে ঘরটা গেল ভরে।

বুঝিয়ে দিল, "অতিথি, তোমরা ক্লান্ত, যদিও তোমাদের এখন কিছু দেবার কথা নয় তাও তোমাদের না দিয়ে পারলাম না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে আমাদের দেশ দেখবে। ধরে নাও. আমি তোমার ছোট বোন, আর তোমার মেয়ের মাসী। দ্বিধা কোর না।'

বললাম, "তোমার কথাতেই অর্ধেক ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। বাকিটা তোমার হাতের কফিতে হবে। যা বলেছ তার তুলনা নেই। তুমি আমাদের কবির ভাষায় 'তুলনাহীনা' সব দিকে।"

হেসে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। ওর কাজ আছে।

এর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দেখ, চেহারার সঙ্গে মনের ও ব্যবহারের কত মিল। ভগবানের সৃষ্টি ত বেশীর ভাগ এমনটি হয় না। একদিকে যদি দেয়, অন্যদিকে দেয় না। ওঁর ত বদনাম আছে অকৃপণ নয় বলে। এটা কি হোল?"

সৃষ্টিকর্তার অনেক ভুলের মধ্যে এই একটি আর কি"

কফি খেয়ে তিনজনেই বেরিয়ে পড়লাম সারাদিনের জন্য।

প্রথমই আমরা গেলাম ইউরোপের সব চাইতে সুন্দর মিউজিয়াম "কুনস্ট হলেতে (Kunsthalle)। সেখানে ষোল শতক থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের পেইনটিংস সব আছে। রেমব্রাণ্ট ও টিওপোলোরও আছে। এসব দেশে মিউজিয়ামের যেন শেষ নেই। এর ভেতর দিয়েই এরা সারা দেশটার শিক্ষার মান অনেক ওপরে তুলে দিয়েছে। এসব দেখে লোকেরা অজান্তে কত কিছু শিখে ফেলেছে অনায়াসে। শেখো, এই কথা বললে বোধহয় বোঝা ও জানার ইচ্ছাও শিথিল হয়ে আসে।

এই মিউজিয়ামে হরেক রকমের জিনিস রাখা আছে। পুরাকালের এই দেশের শিল্প, নানা ধরনের নানা যুগের স্থাপত্য, গ্রাফিক আর্টের নমুনা আর মুদ্রা।

এর পাশেই রয়েছে কুন্স্টভেরিন্। নতুন স্টাইলে বানানো মিউজিয়াম।

এখানে দেখলাম মধ্যযুগের নানা ধরনের স্থপতি বিদ্যার নিদর্শন। কাঠের উপর অপূর্ব কারুকার্য করা জিনিস। মধ্য যুগের সুন্দর সুন্দর মূর্তি আর সেই সব যুগের মুদ্রা।

এই দুটি মিউজিয়াম খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সেই যুগের এই শহর যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে হোল, আমি নিজেই যেন সেই যুগে চলে গেছি। সে সব যুগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছি জিনিস কিনতে ও বিক্রি করতে। তাই চোখ খুলে সব দেখছি এখন।

সেই সময় ভারতবর্ষ ছিল পৃথিবী বিখ্যাত, ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পে। তাই বোধহয় মনে মনে সেই দিনগুলোতে ফিরে গিয়ে খুব ভাল লাগছিল। কিন্তু স্বপ্ন যতই মধুর হোক তা নিয়ে ত দিন চলে না। তাই বাস্তবে এলাম ফিরে।

অনেক কিছু চোখ দিয়ে দেখতে হবে, মন দিয়ে শিখতে, অনুভব করতে হবে স্বল্প সময়ের মধ্যে। আরও কত যে মিউজিয়াম আছে এখানে তার ঠিক নেই।

সব বাদ দিয়ে আমরা চলে গেলাম অতি আধুনিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বানানো অপেরা হাউস দেখতে। চোখ জুড়িয়ে গেল। কি অপূর্ব। সেটা ছাড়িয়ে গিয়েই পেলাম জার্মানীর প্রথম অপেরা হাউস। এটি বানানো হয়েছিল ষোল শ' সাতাত্তরে।

অপেরা হাউসগুলো দেখতে দেখতেই খিদে পেয়ে গেল। তাকিয়েই দেখি ঠিক উল্টো দিকে সুন্দর সুন্দর কাফে। পেস্ট্রিগুলো দেখেই প্রায় জিভ দিয়ে জল পড়ার যোগাড়। ঢুকলাম গিয়ে তিনজনে লাঞ্চ বারে। দিলাম অর্ডার হামবারগারস্টিকের। এ দেশের বিশেষত্ব।

এখানকার গলদা চিংড়ির খুব নাম। রাতে খাবার জন্য তা রইল তোলা। স্টিকের সঙ্গে নিলাম রোল, ওয়াইন আর পেসট্রি।

এখানকার (Planten un Blomen) পার্কগুলো ঘুরে দেখতে দেখতে মনটা যেমন আনন্দে ভরে উঠছিল তেমনি দুঃখে ভেঙে পড়ছিল। আমার দেশের পার্কগুলোর কি ছন্নছাড়া চেহারা। যা বা আছে, ছন্ন-

ছাড়া মানুষ সেগুলিকে নিজেদের চেহারার শামিল করবার জন্য ব্যস্ত। মানে নষ্ট করবার জন্য।

মনে হয় পশ্চিমের লোকেরা স্বর্গ থেকে এসে সব কিছু ভুলে যায়নি। স্বর্গের বাগানের মত করে বানিয়েছে। আর সকলে মিলে সেইভাবেই রেখেছে।

এই সব পার্কে অনেক কিছু দেখলাম। কাঁচের অবজারভেসন টাওয়ার, মিনিয়েচার রেল রোড। ছয়টি এগজিবিসন হল।

আরো আছে অনেক কৃত্রিম ঝরণা। সন্ধ্যেবেলা কনসার্টের তালে তালে ঝরণার জল নাচতে থাকে আর তার সঙ্গে রং বদলানোর খেলা চলতে থাকে।

ওখান থেকে আমরা গেলাম গত মহাযুদ্ধের পরে যেসব এপার্টমেন্ট ব্লকস তৈরি হয়েছে তাই দেখতে। পশ্চিমে এই রকম সুন্দর এপার্টমেন্ট হাউস নাকি আর কোথাও নেই, এই কথা শুনলাম।

সত্যি কথা বলতে পার্কগুলো আমার এত ভাল লাগছিল যে মনে হচ্ছিল যদি আমি শিল্পী হতাম তবে ইঁট পাটকেল দেখে সময় নষ্ট ও চোখ ক্লান্ত না করে রং তুলি নিয়ে বসে যেতাম। প্রকৃতির রূপকে মানুষ কি ভাবে ধরে রেখেছে তাই আঁকতে।

এপার্টমেন্ট হাউসগুলো দেখতে দেখতেই সন্ধ্যের আলো জ্বলে উঠল। এ প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো নয়, আমার দেশের টিমটিমে ইলেক্ট্রিকের আলো নয়। এ হচ্ছে মানুষের তৈরি সূর্যের আলো। এর প্রখরতা নেই, কিন্তু প্রাচুর্য আছে। একটি ছুঁচ পড়ে গেলেও তুলে নেওয়া যাবে। এর রূপ চোখ ঝলসানো। চারিদিক আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠল।

মনে পড়ে গেল দিল্লির ছাব্বিশে জানুয়ারীর দিনটার কথা। বিশেষ করে যে ছাব্বিশে জানুয়ারীতে বিশেষ অতিথিরূপে এসেছিলেন প্রিন্স ফিলিপ। সেদিন নূতন দিল্লির রূপের সীমা ছিল না। মনে আছে সারারাত রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়েছি। ঘুরে বেড়িয়েছি বললে কম বলা হয়। নেচে বেড়িয়েছি।

অদূর ভবিষ্যতে আমার সোনার দেশও এই রূপ নেবে। ইলেকট্রিকের তখন কোন কিছু কমতি হবে না। লোড শেডিং কথাটা ভুলে যাব। মনে হোল, সেদিন আর বেশী দেরি নেই। এলো বলে।

আমরা চললাম সেণ্ট পলি কোয়ার্টারে। মনে হোল, এ এক আলাদা রাজ্য। রাতটাই এখানে দিন। শুনলাম এদিকটার চার্জে আছেন এক মেয়ে পুলিশ অফিসার। এখানকার মেয়েরা ত ছেলেদের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক দিকেই সমান কদমে এগিয়ে চলেছে।

সেণ্ট পলি কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে একটা রেস্টুরেণ্টে গিয়ে ঢুকলাম। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেশ ক্লান্তি লাগছিল মনটা ছিল সতেজ, কিন্তু পা দুটো যেন জমাট বাঁধা সিমেণ্টের মত লাগছিল। ঢুকেই একটা ছোট্ট সুইট শেরীর অর্ডার দিলাম। রেস্টুরেণ্টের ঝম্‌ঝমে মিউজিক মনটাকেও ঝমঝমে করে তুলল। চারিদিকের নাচ দেখে আমাদের পা-ও সজীব হয়ে উঠতে আরম্ভ করল।

ভাববেন না আমরা তিনজনে নাচে যোগ দিলাম। সে দিক দিয়ে তিনজনেই ঠুঁটো জগন্নাথ। মেয়ে যে বিলেতে ল'-আর ব্যারিস্টারি পড়ছে, সেও এই বিদ্যেয় একেবারে বিদ্যেধরী।

এবার তিনজনেই গলদা চিংড়ীর ফ্রাই-এর অর্ডার দিলাম। তার সঙ্গে মটরশুঁটির সুপ, রুটি আর একটু পুডিং। নামটা ভুলে গেছি। খেয়ে-দেয়ে পেট ও মন দুইই ঠাণ্ডা হোল।

রাত বেশ হয়েছিল। আমরা তিনজনে সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করতে করতে মনের আনন্দে পথ চলতে শুরু করলাম। কেউ বলে এটা ভাল, কেউ বলে ওটা ভাল। আমি সবশেষে বললাম, সব ভাল।

ভালই যদি না হবে তবে এত কষ্ট করে কেনই বা আসব? বাকি দু'জনেই সায় দিল এই কথায়।

মেয়ে অমনি বলল, "তবে এখন চলতে চলতে কালকের চলার পথটা, মানে কি করা হবে সব ঠিক করে ফেলা যাক। বাড়ি গিয়েই ত ঘুম। ভাববার আর সময় পাওয়া যাবে না।"

বললাম, কালকের কথা কাল। কাল কি হবে কে বলতে পারে? সেইজন্য আজকের এই সুন্দর সার্থক দিনটা নষ্ট করা যায় কি? আজকের সারাদিনে কি পেলাম তাই ভাবি। সেই আনন্দে থাক মনটা ভরে। যা পেয়ে গেছি তাও কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আগামী কাল যা ভাবা হবে যা আশা করা হবে তা নাও হতে পারে। হবেই যে, তার ত কোন ঠিক নেই। তাই যা পেলাম তার আনন্দে মনটা থাক ভরে। যা নাও পেতে পারি তার অপেক্ষা থাক দূরে।"

"তুমি বড় কবি কবি হয়ে যাচ্ছ, মা।"

"মোটেই নয়। দেখ, তুই খেয়াল করিস নি। আমরা প্রায় আমাদের আস্তানার দোরগোড়ায়। তোর মা কবির ঠিক উল্টো। সময় মত অজান্তে দিলাম আলোচনাটা বন্ধ করে। না হলে, কে জানে কতক্ষণ এই প্যানপ্যানানি চলত, আর ঘুমের যেত বারটা বেজে। এখন সকলে ঘরে ঢুকে কাপড়টি বদলে লম্বা ঘুম।"

"ঠিকই ত বলেছ মা। ঘরে ত ঢুকেই যাচ্ছি বলতে গেলে। কথা পালটে নিলাম।"

তিনজনে ত এসে ঢুকলাম ঘরে। বাবা, মেয়ে দু'জনে শুয়ে দিল ঘুম। আমার চোখে তখন সেন্ট পলির ঝলমলে আলো। বাচ্চা থেকেই আলো আমি বড় ভালবাসি। প্রখর আলো নয়, স্নিগ্ধ আলো। তাই সাতসকালে ওঠবার অভ্যাস। সূর্য ঠাকুরকে প্রথম এক দু' ঘণ্টা ভাল লাগে, তার পরে আর তেমন না।

তাই, আলোর কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। পেলাম যখন সকালে ঘুম ভাঙল। দেখি মিষ্টি মেয়েটি স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে কফির ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে আছে

ইচ্ছে হল গাইতে

"প্রভাতে উঠিয়া এ মুখ হেরিনু
দিন যাবে আজি ভালো।"

॥ ষোল ॥

বেরিয়েই ঢুকলাম গিয়ে একটা রাস্তার ধারের খাবার জায়গাতে। পুরো পশ্চিমের দেশেই সকালের খাবার ধারাটা প্রায় একই রকম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের মত এত রকমফের নয়। আজকাল অবশ্য এই দেশেও অনেকটা এক ধারা নেবার চেষ্টা হচ্ছে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়েই সোজা চলে গেলাম সেন্ট পলি পিয়ারস। চড়ে বসলাম নৌকাতে। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

নৌকা করে ঘুরতে ঘুরতে এদের বিরাট শিপবিল্ডিং দেখে চমক লেগে গেল।

পৃথিবীতে সবার আগে এখানকার ইঞ্জিনীয়াররাই উনিশশ এগার সালে জলের নিচে টানেল সুড়ঙ্গ তৈরি করে। নানাভাবে তৈরি খাল অর্থাৎ জলের ধারাকে বিভিন্ন দিকে চালিত করার অপূর্ব কৌশল দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

রকম রকম জিনিস নানাভাবে তুলবার বিভিন্ন টাইপের ক্রেন দেখে মনে হল এ যেন ক্রেনের এগাজবিশনে এসে গেছি।

নৌকোতে ঘুরে ঘুরে সারা শহরের পুরোপুরি রূপটা যেন চোখে পড়ল। বিশেষ করে ভাল লাগছিল নিজেকে শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে একে দেখতে।

মনে হল বড় বড় সাধুদের মত যদি হতে পারতাম। যদি এইভাবে পৃথিবীর সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ে আলাদা করে ভাবতে পারতাম। তবে বোধ হয় পার্থিব জগতের উপকারে আসতে পারতাম।

এ দেশের বিরাট পুরুষ বিসমার্ক। তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ দেখে মনে হল, জার্মানীর এই যে বড়ত্ব সবই এই একটি লোকের জন্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দেশ আগে টুকরো টুকরো ভাগে বিভক্ত ছিল। ইনিই প্রথম সব ভেঙে-চুরে এক করেন। তারপর আস্তে আস্তে এটি একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়।

আবার সেই দেশেরই একজনের অপরিণত বুদ্ধি ও বিবেচনাহীনতার জন্য শক্তিশালী দেশ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সে আর কেউ নয়, হিটলার।

তাই আমাদের দেশের প্রধান নেতারা বোঝাচ্ছেন ডেমোক্রেসীকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে। তার জন্য যদি সাময়িকভাবে কঠোর হতে হয় তা - হতে হবে।

এই দেশে যেখানেই খেতে গেছি একটি জিনিস বিশেষ করে নজরে পড়েছে। এরা যা করে সবই মন দিয়ে, সিরিয়াসলি। খাচ্ছে মনোযোগ দিয়ে। গালগল্প বড় একটা করে না। এদিক দিয়ে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিল আছে। আমরা খাওয়াটাকে বড় মনে ক'র বলে মন দিয়ে খাই। অন্য সব ব্যাপার কিন্তু সিরিয়াসলি নিই না। কপাল দোষে কাজটাকে আমরা মোটেই আসল মনে করি না।

ইংরেজরা আমেরিকানরা এই দিক মানে খাওয়ার ব্যাপারে জার্মানদের থেকে স্বতন্ত্র। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসি, ঠাট্টা, গল্প এই সবকে বেশ প্রাধান্য দেয়। খাওয়াটা তো অবশ্যই আছে।

অন্য দিকে দেখুন কাজের সময় আমরা সুযোগ পেলেই বেশ খোস গল্পে মেতে উঠি। যেমন কলকাতায় কিছুদিন এক স্লোগান উঠেছিল, "আসব যাব মাইনা পাব, কাজ করলে ওভারটাইম"।

জার্মানরা ঠিক উল্টো। না হলে উনিশশ পঁয়তাল্লিশের জার্মানী যে দেখেছে সে উনিশশ সত্তরের জার্মানীকে এক দেশ ভাবতে পারবে না। চোখে দেখেও মনে হবে স্বপ্ন দেখছি।

এই দেশের পঁয়ষট্টি লক্ষেরও বেশী লোক গত মহাযুদ্ধে মারা গেছে। পনের লক্ষেরও বেশী পঙ্গু জীবিত। পশ্চিম জার্মানীতেই শুধু কুড়ি লক্ষেরও বেশী বাড়িঘর ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়।

তার উপরে এই দেশ চার ভাগে বিভক্ত হয়। চার দেশের অধীনে। রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন। ধীরে ধীরে আমেরিকা, ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন জার্মানীর ওপর থেকে কর্তৃত্ব তুলে নিতে লাগল।

এই তিন ভাগ আগে একেবারে আলাদাভাবে ছিল কিন্তু আস্তে

আস্তে এক দেশে পরিণত হয়ে উঠল। অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, চিন্তাধারায়। গড়ে উঠল স্বাধীন দেশের ডেমোক্রেটিক সরকার। মিলিটারী গভর্নমেণ্ট চলে গেল। নূতন দেশ জন্ম নিল উনিশশ উনপঞ্চাশে, দি ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী নামে।

তাই মনে হয় মানুষ সত্যিই শক্তির অংশ না হলে কি করে তার এত শক্তি হতে পারে? মনে নূতন আশা জেগে ওঠে, চোখে নূতন স্বপ্ন।

আমরাও শক্তির অংশ। আমরাও আমাদের দেশকে গড়ে তুলব। বেশী দেরী লাগবে না।

আমরা গেলাম টি ভি টাওয়ার দেখতে। হামবুর্গের সব চাইতে আধুনিক জিনিস। এর নামকরণ হয়েছে এখানকার এক নামী ব্যক্তি হাইনরিখ হার্টজ টুর্মের নামে।

এর কাঁচের অবজারভেশন টাওয়ার চারশ দশ ফুট উচু। এখান থেকে এই শহরকে কি সুন্দর যে লাগছিল। কত মাথা ঘামিয়ে প্ল্যান করে ত বানান।

এখানে ঘুরন্ত রেস্টুরেণ্টে বসে চা খেতে খুব ভাল লাগছিল। এই রেস্টুরেণ্টের ছাদে একুশ হাজার পুচকে পুচকে বাল্‌ব এমনভাবে জ্বলতে থাকে সন্ধ্যে থেকে ঠিক মনে হয় খোলা আকাশের নিচে তারাদের মিটমিটে চোখের তলায় বসে চা খাচ্ছি।

এখানে দেখলাম যারা বসেছে খেতে তারা কিন্তু বেশ আনন্দ করছে, কথা বলছে খাওয়াটা যেন নগণ্য।

এক সেকেণ্ডের জন্য মনে হোল এটা কি? এ দেশের লোকের স্বভাব কি বদলে গেল? তখনই মনে হোল, ও হরি এখানে ত সবাই বিদেশী, মানে টুরিস্ট। কে জানে জার্মানরা যখন টুরিস্ট হয়ে দেশ-বিদেশে যায় তখন বোধ হয় টুরিস্ট-এর বিশেষ বোরখা পরে যায়। কথায় কথায় হাসে, এমনকি খাবার সময়ও।

ঐ যাঃ, দুপুরে খাবার পরে, এখানে সন্ধ্যেবেলা আসার মাঝখানে আরও কয়েকটি জায়গাতে গেছি তা লিখতে একেবারে ভুলে গেছি।

তাতে যে মারাত্মক কিছু হয়ে গেছে তা মোটেই নয়। আমি ত আর ক্রনোলজিকেল অর্ডারে, ধারাবাহিক সময় অনুসারে কিছু লিখতে বসিনি, বা এটা স্ট্যাটিসটিক্সও নয় যে একের পর দুই আসতেই হবে।

সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মত এখন পেছনের কথা বলি।

একটা জায়গাতে গিয়ে আশ্চর্য লাগল। মনে হোল এরা সত্যিই কত মাথাওয়ালা জাত। আজকের পৃথিবী যা ভাবতে শুরু করেছে বা করছে সেই সোশ্যাল সিকিউরিটি এরা বহু আগেই শুরু করেছিল। সমাজকে বাঁচাতে গেলে বিপন্ন মানুষকে বাঁচাতে হবে। কাজ না থাকলে কাজ পাওয়া পর্যন্ত কিছু কিছু দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বয়স্ক লোকদের দায়িত্ব নিতে হবে, বাচ্চাদের দেখতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে মধ্যযুগে তখনকার দিনের মিউনিসিপ্যালিটি কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রীদের জন্য ছোট ছোট সুন্দর বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিল। সেগুলো যেমন ছিল তেমন আছে। তার একটু দূরেই কাঁচ ও স্টীলের তৈরি আকাশ ছোঁয়া সব বাড়ি উঠেছে, তন্বী-তরুণীর মত। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। ও যেন এক স্বয়ম্বর সভার মত। কাকে মালা দিই, কাকে বলি সেরা?

"গায়ে আমার পুলক লাগে,
চোখে ঘনার ঘোর"

রাথহাউস দুর্গও দেখলাম। এইটি রেনেসাঁস স্টাইলে তৈরি। এর চূড়োতে আছে বিরাট এক ঘড়ি। এই দুর্গে আমোদ উৎসব করার বিরাট একটি হল আছে সেখানে বড় বড় উৎসব হয়। এর ছাদ ভল্টের কাজ করে। কারুকার্যখচিত সিংহদরজা আরও অনেক স্থাপত্য বিদ্যার নিদর্শন সেই যুগের সভ্যতার কথা বুঝিয়ে ও জানিয়ে দেয়।

তাই মনে হয় এটি সত্যিই সকলের দেখা উচিত, ওখানে গেলে অবশ্য।

এর কাছেই স্টক এক্সচেঞ্জ ইউরোপের মধ্যে এখানেই প্রথম এটি আরম্ভ হয়। পশ্চিমের এটাই প্রথম স্টক মার্কেট।

এদিককার দুটি নাম করা গথিক স্টাইলের গির্জা, সেন্ট কেথারিনেন

ও সেণ্ট নিকোলাই। গত মহাযুদ্ধে বোমার কল্যাণে এমনভাবে চুরমার হয়ে গেছে দেখে মনটা কেমন করে উঠল।

সত্যিই মানুষই মানুষকে বাঁচায়। আবার সেই মানুষের মধ্যে যখন শয়তান এসে বাসা বাঁধে তখন দানব হয়ে নিজের স্বর্গকেই ধ্বংস করে।

এই দুটি গির্জাকে এরা ধ্বংস স্তূপ হিসাবে রেখেছে। যুদ্ধে যারা মারা গেছে তাদের স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে। দেখে দেখে লোকেদের মনে আসবে যুদ্ধ কি ভয়াবহ ব্যাপার!

পরের দিন সকালে তিনজনে বের হলাম কোচে করে। হামবর্গের পূর্ব দিকে চললাম স্যাক্সন ফরেস্টের দিকে। পথে দেখলাম ষোল শতাব্দীর দুর্গ রেইনবেক। এইটি এখন ফরেস্ট ইনস্টিটিউট হয়েছে।

এই দিকটি বিসমার্কের স্মৃতি জড়ান। তখনকার দিনের জার্মান দেশের সম্রাট কাইজার উইলহেলম এই বিরাট সম্পত্তি বিসমার্ককে তার প্রতি ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ দান করেন। সে দুর্গে তিনি থাকতেন।

তাঁর শেষ জীবন যেখানে কাটান তা এখন বিসমার্ক মিউজিয়াম হয়েছে। তাঁর কবরটি বড় সুন্দরভাবে ও সযত্নে রাখা আছে। সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

মেয়ে হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, এখনও যে এ দেশের লোকে এই বিরাট লোকটিকে মনে রাখে, শ্রদ্ধা জানায়, যদি তার আত্মা এখনও জন্ম না নিয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই কত আনন্দ পায়! তাই না?

'বোধ হয়ত, বোধ হয়ত না। সংসারে মানুষ যাদের সব চাইতে বেশী ভালবাসে পরজন্মে ত সেই স্মৃতি এক কণাও থাকে না। সঠিক ত কেউ কিছু বলতে পারে না তবে মহাপুরুষদের কথা পড়লে মনে হয়। সত্যিই যারা বড় তাদের আকর্ষণ বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়।

এই বনের ভেতর দিয়ে যেতে খুব ভাল লাগছিল। কিছুটা এগিয়ে গিয়েই পেলাম ট্রিটু নামে ছোট্ট একটি জায়গা। এর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য লোকে এখানে ছুটি কাটাতে আসে।

তারপর আমরা গেলাম আলস্টার ভ্যালীর ভেতর দিয়ে। থামা হয়নি। বড় মন ভোলান পারিপার্শ্বিক। এ দৃশ্য মন মাতান নয়, মন

ভোলান। মনকে আনন্দে উচ্ছল করে তোলে! মনকে শান্ত করে আনে, শান্তি দেয়।

ফেরার পথে বিপথে চলে গিয়ে হাজির হওয়া গেল ব্লেক কিনসে। এইটি হামবুর্গের একটি শহরতলি।

এখানকার পরিবেশটি বেশ। ছোট ছোট সবুজ পাহাড়, সুন্দর বাগানওয়ালা ভিলা। আর ফুলের বাগানের ত একেবারে ছড়াছড়ি। পাহাড়ের টিলার উপরে দাঁড়িয়ে এল্‌ব নদীকে দূর থেকে দেখতে সত্যিই খুব ভাল লাগছিল।

এসব দেশে খাবার কোন চিন্তা নেই। দুপুরে কোচ বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন একটি হোটেলের কাছে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। এই ট্রিপটির সময় কিন্তু দিনক্ষণের কিছু গোলমাল ছিল না। দেখলাম সবই সুন্দর-ভাবে। অঘটন কোন ঘটেনি সেরকম।

আমাদের সামনের সিটে দুজন আমেরকান বসেছিল। মনে হোল দুই বন্ধু। মধ্যবয়সী দুই ভদ্রলোক। একেবারে চুপচাপ। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্চল। আমার কেমন লাগছিল। এই দুজন এত চুপ করে আছে কেন?

এত সুন্দর দৃশ্যের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সবারই মুখ খুলে যায়। নানা ভাষাভাষী চলেছে। নানান ভাষার টুকটাক কানে আসছে; মনে ঢুকছে না। বুঝছি না ত ছাই ফিসফাস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

এই দুজন একেবারে অন্যদের চাইতে আলাদা। খেয়াল করে দেখে বুঝলাম দুজনেই আনন্দ পাচ্ছে। চোখের ভাষা ত কেউ লুকোতে পারে না।

যাই হোক আমার যেন কেমন লাগছিল। কেন এরা এত চুপ। এদের ভাষা ত জানি। কথা বললে কেমন হয়।

বলব কি বলব না এই দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হোল একজন পিছন ফিরে আমার হাতের ঘড়িটার দিকে ইশারা করল। প্রথমে আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। কি জানতে চায়. সময়? দাম? কোথাকার তৈরি? যাই হোক চট করে সময়টা

বললাম। তখনই মাথা নেড়ে হাসল ধন্যবাদ জানাবার ভঙ্গিতে। নিজের ঘড়িটা দম দিয়ে ঠিক করল।

পরে বুঝতে পারলাম দুজনেই কথা বলতে পারে না। শুনতে পায়। তাই দেখলাম দুজনেই নোট বই-এ সামনে লিখে যাচ্ছে।

ভেবেছিলাম এরা বুঝি কবি, তাই সুন্দর দৃশ্য দেখে কবিতা লিখছে।

পরে বুঝলাম দুজনের সঙ্গে এইভাবেই ওরা কথা বলে ওদের কাছ থেকেই জানলাম স্কুল থেকেই ওরা বন্ধু। ভাল কাজ করে দুজনে। কাছাকাছি থাকে। সারা জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ সবই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। বুঝিয়ে দিল ওরা বেশ আছে। দেখতেও মনে হোল ওরা যে অশান্তিতে আছে তা নয়।

তখনই মনে হোল ভগবান বোধ হয় সব দিক দিয়ে কাউকে বঞ্চিত করেন না। তাই কেমন একরকম দুজনকে একজায়গাতে জুটিয়ে দিয়েছেন। এদের কথাতে যখন মনটা ব্যস্ত ছিল হঠাৎ দেখি গাড়ি গেছে ঠেকে আঘাটায়। মানে যেখানে থামবার কথা নয়।

কল বিকল হয়েছে। ড্রাইভার সাহেব ও কনডাকটার নেমে ঠিক-ঠাক করতে লাগল।

তাড়াতাড়ি সারবার নয় বোঝা গেল। আর বোঝা গেল গন্তব্য স্থলে আর যাওয়া যাবে না। সোজা ফিরতে হবে হামবুর্গে।

তখন শুধু মনে মনে ভাবছি যা দেখেছি তাই যথেষ্ট। হামবুর্গে পৌঁছাতে পারলে বাঁচি।

রাত্রে পাড়ি দিতে হবে অন্যত্র। ট্রেনের টিকিট কাটা আছে। বেশ রাতে ট্রেন। সময় আছে হাতে।

মেয়ে বলল, "অত ভাবছ কেন, একদিন না হয় বেশী থেকে যাওয়া হবে।"

"তুই ত নষ্টের গোড়া। ধরা বাঁধা ছুটি। তার মধ্যে সব দেখা শেষ করতে হবে। তাছাড়া তুই এত দুষ্টু যে তোকে ছাড়া ত কোথাও গিয়ে আনন্দ পাব না।"

হঠাৎ ইঞ্জিন গর্জন করে জানিয়ে দিল,

"চলি গো, চলি গো
যাই গো চলে"

॥ সতের ॥

সময়ের অভাব। তাই ট্রেনে চেপে সোজা পাড়ি দিয়েছি বার্লিনের পথে।

মনটা কেমন কেমন করছে। দেখবার অনেক জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বারে বারে মনে হয়েছে এই যে বিশ্বসংসার এত বিরাট যে তাকে মানুষ কখন দেখবে, কখন জানবে।

সময় যে নেই। জীবন বড় ছোট। তার চাইতেও ছোট সুযোগ।

এমন দিন কি কোনদিন আসবে, সারা বিশ্বসংসার মানুষের হাতের মুঠোর মধ্যে? তা বোধহয় কোন যুগেই হবে না। হতে পারবে না। তাই মানুষ এত ক্ষুদ্র আর সৃষ্টি এত বিরাট।

চোখ বুজে ভাবছিলাম কিছুদিন পরে লণ্ডনে ফিরে যাব। কিন্তু সেই জায়গাতে যাওয়া হোল না যেখানকার লোকের জন্য ইংলিশ আর ইংল্যাণ্ড নামটা এসেছে।

শ্লেসউইগ, ফ্লেনসবার্গ শ্লেই এই সব জায়গাগুলো একসঙ্গে জুড়ে বলা হয় এনগেল্‌ন। দেড় হাজার বৎসর আগে এনগেল্‌নরা, মানে এখানকার লোকেরা নর্থ সি পেরিয়ে যায় ব্রিটিশ আইলসে ও ইংল্যাণ্ড আবিষ্কার করে। সেই থেকেই ওই দ্বীপপুঞ্জের ভাষার নাম হয় ইংলিশ।

এমনি বিধাতার ঘটনা সৃষ্টির ক্ষমতা বা তাঁর এমনি খেলা যে এই জার্মানীরই অসনাব্রুক শহরে ষোলশ ষাটে জন্ম নেন প্রথম জর্জ, ইলেকটর অভ হ্যানোভারের ছেলে। পরে তিনিই ইংল্যাণ্ডের রাজা হন প্রথম জর্জ হিসাবে।

ছোটবেলায় অনেকেই পাইড পাইপার অব হ্যামেলিন নামের মজার কবিতাটি পড়েছে। আমিও পড়েছি কিন্তু কখনও ভাবিনি জীবনের কোন সময় সেই জায়গাটির পাশ দিয়ে চলে যাব।

সেই কবেকার ছড়াটার কথা মনে আসতেই কেমন হাসি পাচ্ছিল।

ভুলেই গিয়েছিলাম আমার বয়স হয়েছে, কলেজে পড়া মেয়ের মা। পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়ে ছেলেবেলায় যেমন ফিকফিক করে হাসতাম আর কবিতাটি পড়তাম, তেমনি ফিক করে হেসে ফেলেছি।

রাতের চেয়ার কারে সবাই বলতে গেলে ঘুমন্ত। পাশের চেয়ারে সে বসে ঘুমাচ্ছিল। ঘুম ছুটে গেল। বলল,—"কি হোল? ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে হাসছ?"

মাথা নাড়লাম।

কি আর বলব, ঘুমোইনি ত মোটে। জেগে জেগেই এই হাসি কি করে বলব।

"পাইড পাইপার অব হ্যামেলিন"— হ্যামেলিন জায়গাটি ছেড়ে চলে গেলাম। শুনেছি গরমের সময় প্রায় প্রতি রবিবার পাইড পাইপারের গল্প অভিনীত হয়। পাইপার মধ্যযুগের পোশাক-আশাক পরে শহরের রাস্তা দিয়ে যায় আর বাচ্চা ছেলেরা ইঁদুর সেজে তার পিছে পিছে ইঁদুরের নাচ নাচতে নাচতে যায়।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আর স্বপ্ন দেখছি পরীর গল্পের সাবাবুর্গ দুর্গের স্লিপিং বিউটি যেন আমি নিজেই। ঘুম ভেঙে গেল। কোথায় দুর্গ কোথায় স্লিপিং বিউটি।

জলজ্যান্ত আমি, মধ্যযুগের স্লিপিং বিউটি নই। কলিযুগের আমি চেয়ার কারে বসে আছি।

ট্রেন ছুটে চলেছে বার্লিনের দিকে। ভাল লাগল না। স্বপ্নটা ভেঙে গেল যে!

কেমন সুন্দর এক বিরাট সাজান-গোছান দুর্গে শুয়েছিলাম। না, তার জায়গাতে একটু বাদেই বার্লিনে নেমে বাক্স হাতে ছুটোছুটি করতে করতে হবে। পাশ ফিরে শুলাম।

বার্লিনে নেমে চোখ ঝলসে গেল। বিশেষ করে যখন মনে হোল মাত্র কয়েক বৎসর আগেই এই শহর ধ্বংস স্তূপ ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না।

গত মহাযুদ্ধের দাপট এর ওপর দিয়ে পুরোপুরি গেছে। আর

আজ পৃথিবীর যে কোন সত্যিকারের বড় শহরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

এ যে আলাউদ্দিনের প্রদীপের মত ব্যাপার।

এই শহরের কেন্দ্রস্থল কুরফারস্টেনডাম আমেরিকানদের চোখে তাদের ব্রডওয়ে এবং ফিফ্‌থ এভেনিউয়ের মত।

এটা অবশ্য শোনা কথা। আমি এখনও আমেরিকাতে যাইনি।

আমার মনে হোল এক কালের ব্রিটিশ সিংহের দেশ গ্রেট বৃটেনের রাজধানী লণ্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রীট ও পিকাডিলি এক সঙ্গে।

তবেই ভেবে দেখুন কি ব্যাপার। যে সব জিনিস গড়ে উঠেছে এক যুগে, তাকে ছাড়িয়ে গেছে এক লহমায়।

এই জায়গাটাই হচ্ছে বিকিকিনির প্রাণকেন্দ্র। এই শহরের বাকী তিনটি বড় রাস্তা এই রাস্তার সঙ্গে এসে মিলেছে। এখানে যা কিছু বিরাট বিরাট বাড়ি সবই যুদ্ধের পরে বানানো। দোকান পাট, অফিস বিল্ডিং সবই নূতন। সে দিনের ত বানানো।

আমরা জিনিসপত্র রেখে দিয়েছিলাম স্টেশনের ভল্টে। সেখানেই হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে বেরিয়ে পড়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এসে হাজিরা মেরেছিলাম।

ভেবেছিলাম, এদিকটা সেরে কেটে পড়ব অন্য দিকে। কতক্ষণ আর লাগবে। এসে ত চক্ষু চড়কগাছ। বাঙালের হাইকোর্ট দেখার অবস্থা।

তিনজনেই সব কিছু এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে কখন যে সকাল গড়িয়ে দুপুরে পৌঁছেছে টের পাইনি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি একটা বাজে। চটপট গিয়ে ঢুকলাম বড় রাস্তার ওপরের একটি কাফেতে। বসলাম রাস্তার ওপরের কাঁচে ঢাকা বারান্দায়।

বসেই মনে হোল কি ভুলই করেছি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। এইভাবে বসে পুরো জায়গা কি সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে।

এখানকার বিশেষ বিশেষ খাবারের মধ্যে একটা নিলাম। সেটা হচ্ছে ছোট ছোট ইল্ মাছ। কাছের নদী থেকে ধরা, একদম তাজা,

সুন্দর মুখরোচক সসে তৈরি, সঙ্গে আলু সেদ্ধ ও শসার স্যালাড। তারপর নিলাম ক্রীমওয়ালা পুডিং।

খেয়ে উঠে গেলাম কাইজার উইলহেলম মেমোরিয়াল গির্জা দেখতে। এটা উনিশশ একষট্টিতে নূতন করে বানান হয়। খুবই আধুনিক স্টাইলে বানান। এর উপরটাতে এরা বসিয়ে দিয়েছে গত মহাযুদ্ধের ভাঙা চূড়াটি।

এর কাছেই চিড়িয়াখানা। বিশেষ করে গেলাম এইজন্য যে বোমার হাত থেকে বেঁচেছে এই রকম কয়েকটি জানোয়ার আছে। এই জানোয়ারগুলোর নাম সারা জার্মানী জানে। "শান্তি" নামে একটা হাতি, 'নস্চে" হিপোপটেমাস, "মিনা" শিম্পাজী, "স্কচ" পোলার বেয়ার আর "স্কুইপ" ব্রাউন বেয়ার। এই যে টিয়ার গারটেন পার্ক তা হচ্ছে ছয়শ তিরিশ একর জমি নিয়ে। এখনও এটা এত বিরাট ও সুন্দর যে যে কোন পার্কের সঙ্গে তুলনা চলে।

তবে যারা যুদ্ধের আগে একে দেখেছে তাদের সত্যিই কষ্ট হবে। এই পার্কের মধ্যেই ব্যাট্‌ল অব বার্লিনের বেশীর ভাগ ঘটে। শেল ও নানা রকম অস্ত্রের আঘাতে পার্কটি একেবারে ক্ষত বিক্ষত।

তবে এতেও বোধ হয় পার্কের অবস্থা এত খারাপ হোত না। কয়লার অভাবে উনিশশ পঁয়তাল্লিশ ও উনিশশ ছেচাল্লিশ সালের নিদারুণ ঠাণ্ডার সময় লোকেরা সব বড় বড় গাছ কেটে ফেলে। এতেই ওদের প্রাণ বাঁচে। তাছাড়া সব ফুলের বাগানগুলোতে আলুর ক্ষেত বানান হয়।

যাই হোক, এরা যত তাড়াতাড়ি পারে একে আগের চেহারায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কাজ বেশ দ্রুত গতিতে হয়েছে ও হচ্ছে। তবে গাছ বড় হোতে ত সময় নেবে।

প্রকৃতির নিয়ম কিছুটা হেরফের করা যায়। কিছুটাই, তার বেশী ত নয়।

কত কিছু যে এদের কাছ থেকে শিখবার আছে। যুদ্ধেতে যে স্তূপীকৃত জঞ্জাল জমেছিল তার কি সুন্দর একটা ব্যবস্থা করেছে। সেই

দিয়ে ছোট ছোট টিলা করেছে। তাতে ঘাস, গাছপালা লাগিয়ে দিয়েছে। এই করে শহরের সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। আমরাও বোধ হয় প্রয়োজন মত এই বুদ্ধিটা নিলে পারি।

স্টেগ্‌লিটজ ডিস্ট্রিক্ট—শুনলাম এই এরকম এক টিলা, দুশ ষাট ফিট উঁচু। কলকাতাকে এইভাবে কিন্তু বেশ রূপসী করে তোলা যায়। এখানে নদী আছে। টিলা বা পাহাড় নেই। এই দুই-এর সংমিশ্রণে কত বেশী সুন্দর হয়ে ওঠে জায়গা।

দু' কদম বাড়িয়েই দেখি আবার যেন ইংলণ্ডে ফিরে গেছি। ব্যাপারটা কিছুই নয়। একটা বাগানে বা পার্কে গিয়ে দেখলাম, ঠিক ইংলিশ গার্ডেনের স্টাইলে বানান।

যখন বার্লিনের এই অংশটা ইংরেজদের শাসনের নিচে ছিল, সেই সময় এন্‌টনি ইডেন, তখন ফরেন সেক্রেটারী, তাঁর নামে বানান হয়। তাই ইংলণ্ডের বাগানের রূপ দেওয়া হয়।

আজকাল এখানকার লোকেরা ঠাট্টা করে এটিকে বলে "গারডেন অব ইডেন"। পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের সামনে দিয়ে গেলাম। যদিও ভিতরটা কিছুটা জনসাধারণের দেখবার জন্য খোলা থাকে, আমরা যাইনি। অনেক কিছু যে বাকি রয়ে গেছে দেখার।

ট্রেন থেকে নামার পর থেকে ঘুরে ঘুরে মন ও শরীর দুই যেন অত ঠাণ্ডার মধ্যেও তেতে উঠেছিল। রাতও হয়ে এসেছিল।

চললাম ফিরে যেখানে দুপুরে খেয়েছিলাম সেখানের ছোট একটা কাফেতে। ঠিক আগের মত কাঁচে ঢাকা বারান্দায় বসে রাতের খাবারের অর্ডার দিলাম।

আগেই শুনেছিলাম দিনের বেলাতেও এই জায়গা যেমন প্রাণ চঞ্চল, রাতেও তাই। এরই চারিধারে রয়েছে থিয়েটার হল, সিনেমা হাউস, অপেরা হল, আর আছে অগুনতি নাইট ক্লাব। তাই রাতটা এখানে দিনের মতই জীবন্ত।

রাতে অর্ডার দিলাম এখানকার আর একটা বিশেষ খাবার কনিগ্‌সবার্গার ক্লপস্‌। মাংসের কোপ্তার মতো মাংস দিয়ে বল বানানো।

হেরিং মাছ ও কিপার্স মাছ। চমৎকার খেতে মাছ মাংস দুটোই। একসঙ্গে করে একটা ডিশ তৈরি করেছে। লাইপজিগার অ্যালালেই নামে আরও একটা ডিশ দিলাম অর্ডার। তাজা গাজর, মটরশুঁটি, অ্যাসপারাগাস এবং মাশরুম—এই সব একসঙ্গে করে এত সুন্দর রান্না করেছিল যে এখনো ভাবলে জিভে জল আসে। এই দুটি ডিশে আমাদের তিনজনের বেশ ভালভাবে খাওয়া হোল।

বাঙালীর স্বভাব যাবে কোথায়? শেষে মিষ্টি, মানে ভাল একটা পুডিং খেলাম।

এখন গুটি গুটি চললাম স্টেশনের দিকে। বাক্স নিয়ে যাব ছোট একটা হোটেলে। সকালেই টুরিস্ট অফিসে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। এখানে পেয়িং গেস্ট হয়ে কোন পরিবারের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা হোল না। মনটা একটু খুঁত খুঁত করছিল। মানুষের সঙ্গটা বিশেষ, মানে বলতে গেলে একেবারেই এই যাত্রায় পাওয়া যাবে না। হোটেল ত হোটেলই।

সে বলল, "এই ভেবে মন খারাপ করছ কেন? এই জায়গাতে এত দেখবার ও বেড়াবার ব্যাপার আছে, মানুষকে এখানে প্রাধান্য দিলে এখানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে।"

"তা বটে", বললাম হেসে।

কিন্তু মনটা এত দেখার পরও কেমন শুধু মানুষের সঙ্গ পেতে মানে এখানকার মানুষের মনের কথা জানতে ইচ্ছা করছিল।

বাইরেরটা দেখেও বুঝতে পারছিলাম। ওরা দানবের মতো কাজ করতে পারে। সেদিক দিয়ে ভগবান ওদের অদ্ভুত শক্তি দিয়েছেন। মনটার ঠিক এখনও হদিস পাইনি এই বার্লিনের লোকদের।

এরা বোধ হয় সব চাইতে বেশী আঘাত পেয়েছে। যাকে বলে, দেহে মনে একেবারে ক্ষত বিক্ষত।

আমাদের একটা কথা আছে না, "অল্প দুঃখে কাতর বেশী দুঃখে পাথর।" কথাটার কতটা সত্যতা আছে জানি না। তাই মনে হচ্ছিল এদের ভেতরটা একটু ঢুকতে পারলে বোধ হয় এই কথাটার সত্যতা কিছুটা বুঝতে পারব।

হোটেলে ফিরে দেখলাম টি ভির ঘরে অনেকে বসে আছেন। আমরা অবশ্য একটু তাড়াতাড়িই এসে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন ত সারাদিনের জন্য যাযাবর। সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপ টিপ বৃষ্টি। কপাল জোর যে জোরে নয়। বেরিয়ে পড়লাম রেন কোট গায়ে। এসব দেশে বেশীর ভাগই লোকে রেন কোট কাম ওভারকোট ব্যবহার করে। দেশে বিদেশে বেড়াবার সময় আমরা তাই নিয়ে বের হয়েছি।

সোজা চলে গেলাম "ফুন্‌কটারম্" রেডিও টাওয়ারে। শুনেছিলাম, এই বিশতলা বাড়িটার ওপর থেকে বার্লিনকে সত্যিকারের দেখা যায় ও জানা যায়।

সত্যিই তাই। অতো উঁচু থেকে অবাক হয়ে দেখছিলাম। অপূর্ব এর প্ল্যানিং ! আর মনে হচ্ছিল আমার এই কলকাতা সেটা কবে শিখবে !

এখন ত যা হচ্ছে, তাও মনে হয় আমাদের প্ল্যানাররা ইন্‌জিনিয়াররা ভাবে ঠিকই, তবে পুরো ভাবে না।

মানুষ ত আমরাও। শিক্ষা ত আমরাও পাচ্ছি। তবে কোন্ দিকে আমরা খাটো ?

শহরতলিতে গিয়ে উনিশ শতকের গ্রুনেওয়াল্ড দুর্গের চূড়ায় উঠে চারপাশের নদী, বন, হ্রদ, সব মিলিয়ে যে এক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলাম, তা চিরকাল মনের মধ্যে আঁকা থাকবে।

ওখান থেকে ফিরে এসে গেলাম "টিয়ার গারটেনের" নিউ ন্যাশনেল গ্যালারীতে। এটি হচ্ছে অতি আধুনিক ডিজাইনে তৈরি। কাঁচ, ষ্টীল ও কনক্রীটের তৈরি। এখানে উনিশ ও বিশ শতকের পেইনটিংস দেখলাম। আর দেখলাম সেই যুগের স্থাপত্য। এই চলা ফেরার মধ্যে এক সময় খেয়ে নিয়েছিলাম দুপুরের খাবার।

বারে বারেই সেই একই কথা মনে হয়। এসব দেশে পথে ঘাটে বেড়ানটাও যেমন একটা সমস্যা নয়, খাওয়াটাও কোন সমস্যা নয়। সবই সুব্যবস্থা, সবই সুবন্দোবস্ত। আমাদের দেশে বের হতে গেলে যেমন দশ রকম চিন্তা করতে হয়, এখানে তা নয়।

হুট্ বলতেই হুট্! ছোট্ট একটা ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়। পকেটে রেস্ত থাকলেই হোল। অতি সস্তা খাবার জায়গাতেও ভেজালের অভাব যেমন, পরিচ্ছন্নতার প্রভাব তেমনি।

আবহমান কাল থেকে নাইট ক্লাব ও নাইট লাইফ এই জায়গাকে প্রসিদ্ধি বা কুখ্যাত, যা ইচ্ছা বলতে পারেন, করে রেখেছে। তার মধ্যে কতকগুলো অনেকদিন থেকেই এই শহরকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

"বল হাউস রেসি" এদের মধ্যে একটা। এটা এত বড় যে প্রায় আটশ ছেলেমেয়ে একসঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করতে পারে।

এখানকার এক অদ্ভুত মজার কাণ্ড দেখলাম। প্রত্যেক টেবিলেই টেলিফোন আছে—এবং প্রত্যেক টেলিফোনের নম্বর লেখা কাগজ রাখা আছে। এতজনের মধ্যে যাকে তোমার ইচ্ছে তাকে ফোন করে একসঙ্গে নাচবার বা খাবার জন্য নেমন্তন্ন করতে পার।

যদি একটা ছেলে ও মেয়ে একসঙ্গে এসে থাকে তাতেও কোন গোলমাল নেই। একটা ছেলে যদি সেই মেয়েটির সঙ্গে নাচতে চায় ও মেয়েটিও চায়—তবে ঠিক আছে। তাতে সঙ্গের ছেলেটির মনে করবার কিছু নেই।

এখানে খুব সুন্দর "ওয়াটার শো" বা জলকেলি দেখবার মত।

আর একটা জায়গা আছে শুনলাম যাকে বলা হয় "দি উইডোস বল" বা "বিধবাদের নাচঘর।" এই জায়গাটার নাম বেশ খারাপ। পুরুষ মানুষ ধরবার জায়গা বলে। নামটা শুনে এবং পুরুষমানুষ ধরার জায়গা বলে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। যে ভদ্রলোক আমাদের এইসব বলেছিলেন, তাঁর সামনে গম্ভীর মুখ করেই থাকতে হচ্ছিল। অজানা লোক তো শত হলেও।

কত কচি খোকাই যেন যায় ওখানে। এসবই ত সকলের জানা। আমরা দুদিনের জন্য গেছি, এত কথা জানতে পারলাম। ধরা দেবার জন্যই ত ওখানে যায়। এতে লুকোচুরি কিছু নেই।

"ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানি না" ভাবের চাইতে ভাল।

"রিফিফি" খুব নাম করা গরমাগরম স্ট্রিপটিজ প্রোগ্রাম—নগ্নপ্রায়

নৃত্য, নাহয় উন্মোচন নৃত্য কি বলব—এর জন্য খুব নাম আছে। এইসব নানা জায়গা দেখতে দেখতে বেশ রাত হয়ে গেল।

এখানে প্ল্যানের ছড়াছড়ি দেখে আমাদের তিনজনেরও প্ল্যান করার উৎসাহ হয়ে গিয়েছিল। পরের দিনের শহরতলি দেখবার কোচের টিকিট আগেই কিনে ফেলেছিলাম।

মেয়ে শুতে শুতে বলল, "আমরা এখন থেকে পাঁচ বছরের প্ল্যান কষে চলব, কি বল? প্ল্যান কষাটাই যদি না শিখি তাহলে এখানে আসাটাই ত বৃথা, কি বল?"

তা বটে। তবুও বোধ হয়, একটু কিন্তু কিন্তু থেকে যায়। সর্বম্ অনিত্যম্ কিনা।

॥ আঠার ॥

সকালে যখন চোখ মেললাম, মনে হোল রাতের আমেজ তখনও চোখে ও মনে লেগে রয়েছে। সুর্মার প্রায় মিলিয়ে যাওয়া রেখার মত।

অনেক রাত অবধি বার্লিনের রাতের মাদকতা দেখে যখন ফিরেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল এই অতি ক্ষণস্থায়ী আনন্দে এরা কেন এত মেতে ওঠে। ক্ষণিকের মুহূর্তকে কেন এরা প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চায়। মনে হোল, গত মহাযুদ্ধেরই এটা একটা ফলশ্রুতি।

এরা জীবনটাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করতে পারছে না। যে কোন মুহূর্তে মহাকাল যাওয়ার পরোয়ানা হাতে ধরিয়ে দিতে পারে। তাই যতটা পারা যায় পেয়ে নাও, নিয়ে নাও।

এই অনিশ্চয়তার রেশ মনের কোণে নিয়ে এরা যে ভাবে কাজ করছে বা করতে পারে তা সত্যিই অদ্ভুত। মনে হয় এরা সত্যিকারের বিবেকানন্দের বাণী অনুভব করেছে, "কর্মই ধর্ম।" কর্মেই মুক্তি।

আমরা তিন মূর্তিতে গিয়ে এখানকার শহরতলি ডাহ্‌লেম ডিস্ট্রিক্টে যাবার কোচে গিয়ে উঠলাম।

ওখানে যাবার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই জায়গাটিতে মিউজিয়ামের ছড়াছড়ি। এত মিউজিয়াম এক জেলায় আর কোথাও দেখিনি। মনে হোল, এখানকার লোক শুধু বুঝি এই চিন্তাই করেছে।

প্রথমেই গেলাম মিউজিয়াম ডাহ্‌লেমে। ওখানে তের শতক থেকে আঠার শতকের মধ্যের নামী ও দামী পেইন্‌টিংস্ রয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত রেমব্রান্টেরই ছাব্বিশটা আঁকা ছবি আছে। সেই সব ছবির মধ্যে আছে 'ম্যান উইথ গোল্ড হেলমেট্," "ভিসন্ অব ড্যানিয়েল" ও "স্যামসন অ্যাণ্ড ডেলাইলা।" চোদ্দটা রুবেন্সের, আর এক জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। এখানে অনেক নামকরা ভাস্কর্য আছে, তার মধ্যে সব চাইতে মূল্যবান হচ্ছে ইজিপ্টের রাণী নেফারটিটির বাস্ট আবক্ষ মূর্তি।

এটা মাটি খুঁড়ে বের করা হয় উনিশ শ বার সালে ইজিপ্টে টেল-এল আমারনাতে। বিশেষজ্ঞদের মতে এটা সম্ভবত তৈরি হয়েছিল তেরশ সাতাত্তর থেকে তেরশ আটান্ন বি. সি.-র মধ্যে।

ওখান থেকে আমরা গেলাম জার্মানীর সব চাইতে নবীন ইউনিভারসিটি দেখতে। সদ্য তৈরি। তারুণ্য তার সর্ব দেহে। মনে কিন্তু এটি এখনই প্রবীণ। কেননা, তার নামডাক এখনি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

এর নামকরণটাও বড় অভিনব। "ফ্রি ইউনিভারসিটি।" এখানে বাইরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একশর মধ্যে একটা করে সিট রাখা আছে।

আর একটা মিউজিয়ামে গেলাম গ্রুনেওয়াল্ড পার্কের মধ্যে। ওখানে গেলাম বিশেষ করে এজন্য যে সেটা কি করে জানি যুদ্ধের আগের অবস্থায় রয়ে গেছে। এখানকার মিউজিয়মটার রেনেসাঁস স্টাইলের হানটিং লজ লেকের পাড়ে।

এখানে যে শুধু শিকারের ট্রফিই আছে তা নয়। সতের শতকের ডাচ পেইনটিংস আছে। সুন্দর ও মূল্যবান অনেক জার্মান পেইনটিংসও আছে।

শুনলাম, মিউজিয়ামের চকমিলানো দালানে মোমবাতি জ্বালিয়ে বেশ বড় ফাংশন হয়। কনসার্ট বাজান হয়। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে মন কষাকষি ছিল। স্বাভাবিক অবশ্য।

কিন্তু আমরা গেছি মনের খুশীতে, ভাল জিনিস দেখতে ও শিখতে। আমাদেরও মনের মধ্যে আঘাত রয়েছে। পৃথিবীতে দুঃখ ছাড়া কে কবে থাকতে পেরেছে? খোলা মনে আনন্দ করবার জন্য তাই সে দিক দিয়ে চোখের দুয়ার বন্ধ করে রেখেছিলাম।

"চক্রবৎ পরিবর্তন্তে—
দুঃখানি চ সুখানি চ!"

যখন এদিকে পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ মিল হবে, তখন আবার আসব, তখন দেখব, "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।"

একটু এগিয়ে ব্রীজের কাছে দেখলাম কাঠের অতি সুন্দর ও বিরাট একটা বাড়ি বা প্রাসাদ যাই বলুন। এই দেশের সম্রাট, তৃতীয় ফ্রেডেরিক উইলিয়াম বানিয়েছিলেন আঠারশ উনিশে। এখন এটি একটি রেস্টুরেন্টে পরিণত হয়েছে।

এই শুনে পড়লাম ঢুকে। কি কাণ্ড, যেখানে ফ্রেডেরিক উইলিয়াম কম দিন হলেও থেকেছেন, সেখানে সুযোগ যখন পেয়েছি মেরে কেটে এক কাপ কফি না খেয়ে কি যেতে পারি?

যেমন ভাবা, তেমনি করা। থ্রি মাস্কেটিয়ার্স তো ঢুকে পড়লাম। দুপুরের খাবারের জন্য নিলাম প্রেসিস্‌চেস হিমেলরাইক, মানে রোস্ট হাঁস, তার সঙ্গে আলু ভাজা। ভাজা হয়েছে নূতন ধরনে। রসাল ঝোলে তাজা ফলের সঙ্গে। তার সঙ্গে আরো একটা সুপ নিলাম। শেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ। চমৎকার সুন্দর কেক, তার সঙ্গে কফি উইথ ক্রীম।

ঐ রেস্টুরেন্টের জানালা থেকে হ্যাভেল নদী দেখতে খুব ভাল লাগছিল। মনে পড়ে গেল রাজস্থানের কথা। পুরাকালের রাজা-রাজড়া নয়। এই তো সেদিনের ব্যাপার, উদয়পুরের মহারাণা। কত বড় তাঁর রাজ্য। নিজের রাজ্যে তিনিই জজ, তিনিই ম্যাজিস্ট্রেট, তিনিই লাটসাহেব। এক কথায় সর্বময় কর্তা।

যদিও চারিদিকে তখন ব্রিটিশ রাজত্ব চলছে পুরোদমে। তারপর স্বাধীন হল ভারতবর্ষ। উদয়পুরের মহারাণা নিজের থেকে এসে এক হয়ে গেলেন সারা স্বাধীন ভারতের সঙ্গে। এক আত্মা, একপ্রাণ। সেইখানে তাঁরই এক প্রাসাদে গিয়েছিলাম আমরা সমাদৃত অতিথি হিসাবে। রাজরাজড়ার বাড়ি ঘর—থাকা চলা দেখে অবাক লেগেছিল।

লাগবেই না বা কেন? আমাদের মত সাধারণ লোকদের? জানি না মানুষের মন সত্যিই কি চায়। সবই বুঝি। রাজার রাজত্বের চাইতে গণতন্ত্র অনেক ভাল, তবুও এক এক সময় মন ফিরে যায় সেই রাজারাণীদের দেখবার ইচ্ছায়। দেখতে যারা হবে দেব দেবীর মত।

চলনে, বলনে, পোশাকে, আশাকে, সব কিছুতে হবে অসাধারণ। য
আমরা সচরাচর দেখি না।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা চললাম যে পথ দিয়ে কার রেসিং হয়। এইখানেই স্পিড্ রেকর্ড হয়েছিল উনিশ'শ তিরিশে মারসিডিস গাড়িতে। অনেক বৎসর কেউ তা আর ভাঙতে পারেনি। উনিশ'শ আটান্নতে সেটা ভাঙা সম্ভব হয়।

এখানে দুতিন দিন ঘুরেই একটা কথা বেশ বুঝেছিলাম। বার্লিনের লোকেরা অন্য জায়গার জার্মানদের চাইতে অনেকটা আলাদা। শুধু চেহারায় নয়, চিন্তাধারাতেও।

এদের মধ্যে "সেন্স অব হিউমার" আছে যে জিনিসটার সত্যিই বেশ অভাব সারা জার্মানীতে। তাই বোধহয় এরা এত আঘাতের পরেও সহজে হাসে, সহজে জীবনটাকে দেখতে চেষ্টা করে। তাই এদের মধ্যে হৃদয়ের স্পন্দন পাওয়া যায়।

একদিন বার্লিনে হোটেলে ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম ঘর খালি।

বোর্ডাররা বোধহয় তখনও বিশেষ কেউ ফেরেনি। এক কোণে এক ভদ্রলোক, খুব বয়স হয়নি। মাঝারি, মানে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে, উদাস মুখে জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। পাশে প্রায় সেই বয়সের এক ভদ্রমহিলা। একটু পরে পরেই চোখের জল মুছছেন। মনে হোল স্বামী-স্ত্রী।

বুঝলাম কোন একটা বিশেষ আঘাতে দুজনেই আহত।

বাবা আর মেয়ে চলে গেল ঘরে। "আমি আসছি একটু পরে, তোমরা কাপড় বদলে শোবার ব্যবস্থা কর"—এই বলে ড্রইংরুমের একটা বইয়ের র‍্যাকের পাশে বসলাম। খুঁজে পেতে একটা ইংরেজী বই বের করে দুয়েক পাতা পড়েছি কি দেখি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, "তুমি ইংরেজী জান দেখে এগিয়ে এলাম। তোমাকে বিরক্ত করলাম না তো?"

"মোটেই না, আমি বরঞ্চ খুশী হয়েছি। কাল সকালেই তো চলে যাব। তুমি কি বার্লিনের লোক?"

"ঠিকই ধরেছ।"

"তবে হোটেলে আছ কেন?"

"না, হোটেলে তো থাকি না! কয়েক দিনের জন্য বাড়ি বন্ধ করে এখানে এসেছি। আমার স্ত্রী আর ও বাড়িতে থাকতে পারছে না।"

"সংসার করে করে অনেক সময় ওরকম হয়। ছুটির দরকার পড়ে। ভালই করেছ।"

"না, তা ঠিক নয়। জান, কাউকে সব কথা বলতে না পারলে আর থাকতে পারছি না। কিন্তু মুশকিল কি, দুঃখের কথা আমাদের দেশে কাউকে বলা অনেকটা ব্যাড ম্যানারস্ বলে ধরা হয়। সত্যিই তো নিজের দুঃখের বোঝা আর একজনের ঘাড়ে চাপানো তো স্বার্থপরতা।

আমি অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম আর ভাবছিলাম ওদের আর আমাদের চিন্তাধারা কত আলাদা।

তাই বোধহয় কিপলিং লিখেছিলেন—"দি ইস্ট ইজ ইস্ট, দি ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট, অ্যাণ্ড নেভার দি টোয়েন শ্যাল মীট।"

"তুমি তো বিদেশী, কাল তো চলে যাবে। আমাদের দুঃখের কথা তোমাকে কতক্ষণ আর ভারাক্রান্ত করবে। আসল কথা হচ্ছে তোমাকে দেখে মনে হোল, তোমাকে বললে শান্তি বা সান্ত্বনা পাব। বিশেষ করে আমার স্ত্রীর বড় দরকার। ও যেন আর দাঁড়াতে পারছে না।"

এক নাগাড়ে এত কথা বলে থামলেন। আমি কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বুঝলাম বড় দুঃখ পেয়েছেন দু'জনে।

দেখেই যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মনটা ওদের দুঃখে কেঁদে উঠল। আহা রে। এত দুঃখেও পাশে দাঁড়াবার লোক নেই!

আস্তে আস্তে বললাম, "তুমি কিন্তু এখনও আমাকে কিছুই বল নি।"

"কি কাণ্ড দেখ। মানে, এই চারদিন নিজের মধ্যে চেপে রেখে, মন খুলে বলতেই ভুলে গেছি।"

একটু হাসলেন। "জান, আমি ফ্রি ইউনিভারসিটিতে প্রফেসার। আমার স্ত্রী জার্নালিস্ট। আমাদের একটি মাত্র সন্তান। ছেলে বেশ

ভাল পড়াশুনায়। ইউনিভারসিটিতে পড়ে। আমাদের আশা, হয় নামী প্রফেসার হবে অথবা নামী জার্নালিস্ট হবে। সুন্দর স্বাভাবিক ছেলে। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এসে বলল, "আমি একটি হিপি মেয়েকে বিয়ে করেছি। হনিমুনে যাচ্ছি।" সেই কথা শুনে পর্যন্ত আমার স্ত্রী একদম চুপ হয়ে গেছেন আর শুধু কাঁদছেন। এখন ত আমার ছেলের কথা চুলোয় গেছে। স্ত্রীর কথাই শুধু ভাবছি। উনি স্বাভাবিকভাবে কবে কথা বলবেন। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে? এস, আমার স্ত্রীর কাছে চল।"

আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম ভদ্রমহিলার কাছে।

পাথরের মত বসে আছেন ভদ্রমহিলা। শুধু মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। এত বিদূষী মেয়ে, সন্তান-স্নেহের কাছে একটা অর্ধ বা অশিক্ষিত মেয়ের মতই অসহায়। আমি গিয়ে কাছে বসতেই চোখ তুলে তাকালেন।

ভদ্রলোক আমার কথা বললেন। আমি আস্তে আস্তে একটা হাত ধরলাম।

ভদ্রমহিলা একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। কাঁদুক, প্রাণটা হাল্কা হোক। সময়ে সবই সয়ে যায় বা যাবে।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, "শুনেছ তো সব, আমি এখন কি করি। কত আশা করেছিলাম ছেলেকে নিয়ে। পরিষ্কার মাথা। শান্ত ভাল ছেলে। সব শেষ হয়ে গেল।"

"কেন সব শেষ হয়ে গেল ভাবছ? শান্ত হও। হতে পারে, তোমার ছেলের সংসর্গে এসে মেয়েটা শুধরে যাবে। তখন দেখবে যা চেয়েছিলে তাই হয়েছে। ভগবান হাত উপুড় করে সব দিয়েছেন। তারপর এটা যদি না হয়, ধর মেয়েটা বদলাল না। তোমার ছেলেরই মোহ কেটে গেল। বুঝতে পারল, একে নিয়ে সারা জীবন চলতে পারে না। ধর, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তোমরা বিশ্বাস কর কি না জানি না। আমি বিশ্বাস করি যে খারাপ সময় আসে, ঠিক আবার কেটেও

যায়। দুঃখের পরে সুখ আসবেই। যেমন রাত্রির পরে দিন। ভগবানে আমি আস্থা রাখি।”

“তুমি যা বলছ, তা কি সত্য হবে? আবার সব ঠিক হয়ে যাবে? এত দৃঢ় আস্থা কোথায় পেলে তুমি?”

“আমি অনেক দেখেছি—কত কান্না কত দুঃখ, তারপরই কত হাসি, কত শান্তি। তাই বলছি, তুমি উঠে দাঁড়াও, স্বামীকে দাঁড় করিয়ে রাখ। হতে পারে, তোমাকে তোমার ছেলের দরকার হবে। সব চাইতে বড কথা, মানুষ হয়ে জন্মানো আর এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকা। একে তুমি নষ্ট করো না। একথা তোমরা যত বুঝবে, আর কে বুঝবে বল? সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি যদি শেষ হয়ে যাও তবে ঠিক হয়েই বা কি হবে। তাই না?”

“তোমার কথাতে আমি অনেক কিছু উপলব্ধি করলাম, আমার মন শান্ত হয়ে আসছে। আমি আবার সোজা হয়ে দাঁড়াব ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে। কালই বাড়ি ফিরে যাব। ঠিকই তো বলেছ, দুজনে আছি। এই সুন্দর পৃথিবীকে উপভোগ করব। আবার আমরা চারজন হব। তোমার কথা বৃথা হবে না।”

“না, কখনও হবে না। আমি বলছি মনে রেখো।”

আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম। দেখলাম স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই মুখে স্বাভাবিক ভাব। এত ভাল লাগছিল!

মনে মনে ওপরওয়ালাকে জানালাম, ওদের দেখো, তোমার ছেলে-মেয়েদের দেখো।

দুজনেই বলল, “তোমার ঠিকানা দিলে না? তোমাকে সব জানাব। তাছাড়া তোমার দেশে যদি কখনো যাই তোমার কাছে যাব।”

“ঠিকানা দিয়ে কি হবে? যে ঠিকানাই থাকুক আমি তোমাদের মনের মধ্যে রইলাম, আর তোমরা আমার। সব চাইতে বড় ঠিকানা। ভাল থাক, যাই।”

গেলাম নিজের ঘরে। দু'জনে অসাড়ে ঘুমাচ্ছে। মনটা বড়

ভাল লাগছিল। ভগবান আমার ভেতর দিয়ে দু'জনকে শান্তি দিলেন।

এই যে পূর্ব ও পশ্চিমের মেয়েদের মনের চিন্তাধারা দুদিকে বইছে, মনে হয় তা শুধু মানুষের নিজের সৃষ্টি। সামাজিক প্রথা ও পরিবেশের ফল। মানবতার অন্তরের রূপ নয়। তার শাশ্বত স্নেহ মমতা সব দেশে সর্ব কালে একই।

। উনিশ ।

ছোটবেলা থেকেই কেন জানি না অডিকোলনের গন্ধ আমার বড় প্রিয়।

তাই বরাবরই পেট ব্যথা করলেও তার সঙ্গে বলতাম মাথা ধরেছে। জ্বর জ্বর করলেও বলতাম মাথা ধরেছে। এমন কি গা ব্যথার সঙ্গেও মাথা ধরাটা জুড়ে যেত। মা একটু অডিকোলন মাথায় মুখে বুলিয়ে দিলেই মাথা ধরা ছেড়ে যেত।

আস্তে আস্তে বাড়ির সকলেই আমার এই দুর্বলতার কথাটা ধরে ফেলেছিল। তাই মাথা ধরার অজুহাত আর দিতে হোত না—এমনিতেই মাথায়, মুখে, বিছানায় বেশ কয়েক ছিটে অডিকোলন ছড়িয়ে দিত।

যাই হোক, বড় হয়ে অডিকোলনের একটা শিশি আমার সব সময়ের সঙ্গী হয়ে আছে।

এত যার ভক্ত, সেই জিনিসের উৎপত্তি কোথায় তা আগে থেকেই বই পড়ে জেনে নিয়েছিলাম। তাই যেদিন আমরা "কোলনের" দিকে রওনা হলাম, কি যে ভাল লাগছিল।

রাইনল্যাণ্ড, মানে জার্মানীর চতুর্থ বড় শহর হচ্ছে এইটা। বার্লিন, হামবার্গ ও মিউনিখের পরেই এর স্থান।

আঠার শতকে অডিকোলন এই শহরেই প্রথম বানান হয়। সেই থেকেই এর নাম হয় কোলন। জার্মানীতে বলে Koln। এই শহরের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে। রোমানরা ফ্রান্স পর্যন্ত যত সহজে জয় করতে পেরেছিল রাইনল্যাণ্ডকে তত সহজে পারেনি। এখানকার ট্রাইবরা বড় দুর্ধর্ষ ছিল। তাই রোমানদের রাজত্বকালে দক্ষিণ ফ্রান্সকে ওরা বলত প্রভিন্স। কিন্তু রাইনল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করতে না পারায় পঞ্চাশ এ ডি-তে সম্রাজ্ঞী আগ্রিপিনা এই শহরকে দিয়ে দিলেন সিটি চার্টার, অর্থাৎ নগরের সনদ।

দিল্লীর এক বন্ধু কাজের খাতিরে কয়েক বৎসর কোলনে কাটিয়ে-ছিলেন। এখানে একটি জার্মান পরিবারের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। তাদের একটা চিঠি লিখে আমাদের হাতে দিয়েছিলেন, লণ্ডন থেকে যাবার আগে যেন সেটা আমরা সময়ে পোস্ট করে দিই।

তাই ট্রেন থেকে নেমেই সেই জার্মান ভদ্রলোকের বাড়িতে ফোন করা হল। মেয়ে ফোন ধরল: 'তোমাদের চিঠি সময় মত পেয়েছি আর আমাদের বন্ধুর চিঠি তার সঙ্গে। সব ঠিক করে রেখেছি। সোজা আমাদের বাড়িতে চলে এসো। আমরা তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।'

ব্যাস, আর চাই কি। মেয়েটির নির্দেশ মত তিন মূর্তি তো গিয়ে হাজির হলাম ওদের বাড়িতে। বাবা, মা ও মেয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

বাবা, মা ইংরেজী বলতে পারে না। তবে কিছু কিছু বুঝতে পারে। মেয়ে ইংরেজী জানে। ওখানে আজকাল ইংরেজী কম্পালসারী করে দিয়েছে। আগে ছিল না। সবই আমেরিকানদের কল্যাণে।

বুড়ো-বুড়ীর বাড়ি। তাদের একটি মাত্র মেয়ে। মেয়ে, জামাই ও নাতনী ওখানেই থাকে। জামাই ইঞ্জিনীয়ার।

ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন। মেয়েটি সব দিকে লক্ষ্মী। বাড়ির সব ওই চালায়। তাই ওর মাকে বললাম, 'তুমি ভাগ্যবতী'। স্বাভাবিক, শুনে মা খুব খুশী।

আমাদের মেয়েকে ওদের বাড়িতেই রেখে দিল। আমাদের দুজনের জন্য কাছেই একটা হোটেলে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল বেড ও ব্রেকফাস্টের। রাতে ওখানে খেয়ে আমরা দু'জনে চলে এলাম হোটেলে।

সকালে আমরা ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেই মেয়ে ওখান থেকে খেয়ে চলে এলো।

ওরা কত বন্ধুবৎসল, জানেন? বলেছিল, 'তোমরা আমাদের বন্ধুর বন্ধু। তোমাদের তো আমাদের কাছেই রাখা উচিত ছিল। জায়গার অভাবে যে পারলাম না তার জন্য খুব খারাপ লাগছে। তবে রাতে

রোজ কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে খাবে। তাছাড়া, তোমাদের মেয়ে তো আমাদের কাছে থাকবে।'

ইংরেজদের মধ্যে এমনটা কখনও পাওয়া যায় না।

ওখানে তো দেখলাম নিজের মেয়ে জামাই বা ছেলে বৌ এলে কাছাকাছি কোন হোটেলে বন্দোবস্ত করে দেয়। অবশ্য খেতে নেমন্তন্ন করে। দুটি শোবার ঘর থাকলেও নয়। কারণ একটা কর্তার, একটা গিন্নীর। অবশ্য তৃতীয়টা থাকলে স্বতন্ত্র।

বিলেতের এই সব ধরণ-ধারণ দেখে একেবারে চমকে গিয়েছিলাম।

দিল্লীতে মনে পড়ে, অতিথির অভাব ছিল না। এক এক সময় এমন অবস্থা হোত যে, তিনটি শোবার ঘর থাকা সত্ত্বেও বসবার ঘর, খাবার ঘর সবই সাময়িকভাবে রাতে শোবার ঘরে পরিণত হোত।

সকালের খাওয়া শেষ করে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। গত মহাযুদ্ধে এই সহর বলতে গেলে ধ্বংসের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। তবে পুরোন ইতিহাসের চিহ্ন একেবারে মুছে দিতে পারেনি।

দেখলাম তৃতীয় শতাব্দীর রোমান টাওয়ার আর সেই যুগের মোজেইক কাজ করা মেঝে। এই কারুকার্যের নাম ডাইওনিসাস মোজেইক। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন বোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্য চারিদিকে খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছিল সেই সময় এই অতি মূল্যবান জিনিসটা বেরিয়ে আসে।

অমঙ্গলের ভেতর থেকেও যে অনেক সময় মঙ্গলের আভাস পাওয়া যায় এটা বোধহয় তার একটা দৃষ্টান্ত।

বিশেষ অবাক হয়ে দেখছিলাম অতি আগের যুগের সভ্য মানুষরা কত কিছু বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। এর কারুকার্য দেখলে অবাক হতে হয়।

তাছাড়া মাটির নিচে তখনকার লাটসাহেবের বাড়ির কিছু অংশ অক্ষুণ্ণভাবে রয়েছে।

মধ্যযুগের ক্যাথিড্রাল সত্যিই অপরূপ। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার যে এটা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই গথিক চার্চটা পৃথিবীবিখ্যাত।

এর দুটি মিনার হচ্ছে পাঁচশ' পনের ফুট উঁচু। এর সূক্ষ্ম কারুকার্যের যেন কোন তুলনা নেই।

তাকিয়ে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের পৃথিবীবিখ্যাত তাজমহলের কথা। মানুষ যদি এই রকম স্বর্গীয় সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারে তবে সে দেবতা থেকে আর কত দূরে ?

তাই তো আমাদের সাধুরা বলেছেন, ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁরই অংশ থেকে। তাই বারে বারেই ঋষিরা মনে করিয়ে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, "সোহং"—"তুমিই আমি, আমিই তুমি"।

আরও কিছু পুরাকালের মানে রোমান রাজত্বের সময়কার জিনিস বোমা শেষ করতে পারেনি। যেমন সম্রাট অটোর ভাই সেণ্ট ব্রুনোর কবরস্থান, সেণ্ট পেন্টানিয়ন গির্জা, সম্রাট দ্বিতীয় অটোর মা বাইজানটাইন রাজকুমারী থিওফানোর সোনার ঘর। তার মধ্যে অনেক মূল্যবান জিনিস আছে।

এতে একটা হাতির দাঁতের বাক্সে খোদাই করা দৃশ্য আছে যে একজন নাইট অর্থাৎ সামন্ত তার বান্ধবীর সঙ্গে দাবা খেলছে।

সব যুগেই মানুষ শত দুঃখের মধ্যেও আনন্দ করতে চায়। ক্ষণিকের জন্য হলেও চায় সব ভুলে থাকতে। তাই সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে —"স্বপন যদি মধুর এমন, হোক সে মিছে কল্পনা"—রূঢ় বাস্তব থেকে একটু সময়ের জন্য সে চায় ছুটি। তাই তো সংসারে সে পাগল না হয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

সেই জন্যই রোমানদের রাজত্বকালে বড় দার্শনিক বলেছিলেন, লোকেদের পেট ভরে খেতে দাও আর দাও বিনা পয়সায় আনন্দ করবার ব্যবস্থা।

দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে সেই কথাটাই বারে বারে মনে হয়েছে।

কোলনে দেখলাম পনের শতকের বিনোদন কেন্দ্র গুরজেনিক। এই জায়গা বানানো হয়েছিল নাচ, গান, আনন্দ করবার জন্য। মধ্যযুগে সকলে এসে এখানে নাচত, গাইত, আনন্দ করত।

এখানকার সব চাইতে আনন্দের সময় হচ্ছে কারনিভ্যালের সময়। সেই সময় বয়স নির্বিশেষে সকলেই আনন্দে মেতে ওঠে।

পাঁচশ বৎসর আগে মানুষ যে রকম সব কিছু ভুলে এই সময় আনন্দের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিত, সেই রকম এখনো কারনিভ্যালের সময় কবির ভাষায় সেই দেশে "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'র অবস্থা দাঁড়ায়।

বড় ছোট সব নাচঘরে তখন আনন্দের ফোয়ারা ছোটে ঠিক যেমন পাঁচশ' বৎসর আগে এই সময়টাতে হোত।

নাচঘরে যাদের জায়গা না হয় তারা আসে গুরজেনিকে নাচতে. গাইতে, স্ফূর্তি করতে।

কোলন শহর ঘুরতে ঘুরতে কখনও মন চলে যাচ্ছিল অতীতে. কখনও বর্তমানে। তখনই মনে হয় আত্মা শরীরের কত উর্দ্ধে। আত্মা অবিনশ্বর, শরীর নশ্বর। সেই আত্মারই নিকটতম সহচরী হচ্ছে মন। তাই তো শরীরটাকে বর্তমানে ফেলে রেখে মন যুগ যুগ পিছে চলে যায়।

আবার যে মনের শক্তি আছে সে যুগ যুগ পরের ঘটনাও দেখতে পায়। আমরা সাধারণ লোক অতীতে যেমন ফিরে যেতে পারি, ভবিষ্যৎ কি দেখতে পাই ?

মনে পড়ল ফ্রান্সের রাজা হেনরী দি ফোর্থের নির্বাসিতা অভিশপ্ত মারিয়া দ্য মেদিচির এইখানে মৃত্যু হয়। তবে এটা ঠিক, অন্য অনেক রাণীর চাইতে এঁর ভাগ্য মন্দের ভাল ছিল। মাথাটা ঘাড়ের উপর রেখেই চলে আসতে পেরেছিলেন। ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরীর রাণীদের কারো কারো ভাগ্যে তাও সম্ভব হয়নি।

সত্যিই মনে হয় রাজা-রাণীর যুগটা চলে গিয়ে বোধহয় শুধু সাধারণ লোকদের জন্য কেন, রাজা-রাণীদেরও ভাল হয়েছে। কখন যে কার কি হবে ঠিক থাকত না।

এই শহরের প্রায় অর্ধেকটাই বোমায় শেষ হয়েছিল গত মহাযুদ্ধে। কিন্তু আশ্চর্য এই এক জার্মান জাত। ভাঙলেও মচকায় না। আবার খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এই শহরই দেখুন না Typography ও Photogıaphy-তে ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছে। শুধু কি তাই? টেক্সটাইল ও ফ্যাসান সৃষ্টিতে এদের খুব নাম।

এদের নূতন শহর দেখলে সত্যিই চোখ ঝলসে যায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে মনে হয় পরীর সোনার কাঠির ছোঁয়ায় পলকে সব বিরাট বিরাট আকাশ ছোঁয়া বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। এখানকার দি গারলিং স্কাইক্র্যাপার, আলট্রা মডার্ন অপেরা হাউস, চেম্বার অব কমার্স বিল্ডিং, সবই অপূর্ব, অভিনব।

এখানকার ওয়ালরাফ রিচার্টজ মিউজিয়াম সত্যি দেখবার জিনিস। এখানে চেনা হয়ে গেল এক জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে। এত সুন্দর করে পুরোন ডাচ ও ফ্রেমিশ পেইন্টিংস এবং জার্মান পেইন্টিংসগুলোর বিষয় বলছিলেন যে ইচ্ছা করছিল দিনের পর দিন শুধু ওঁর কাছ থেকে সব শুনি। এর চাইতে আনন্দ বোধহয় আর কোন কিছু দিতে পারে না।

পরে জানলাম উনি এখানকার একজন আর্ট স্টুডেন্ট। আমার আগ্রহ ও তন্ময়তা দেখে উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি আর্টিস্ট? তুমি কি আঁক?"

বলেছিলাম, "ঠিক উল্টা, সোজা করে—একটা লাইনও বোধহয় টানতে পারব না।"

"তুমি তো হিন্দু। তাই না?"

"অবশ্য।"

"তবে তো জন্ম-জন্মান্তর বিশ্বাস কর?"

"শুধু বিশ্বাস করি বললে কম বলা হবে, মনে প্রাণে উপলব্ধি করি।"

"তবে বলব—গত জন্মে তুমি নামী আর্টিস্ট ছিলে। যে কারণেই হোক এ জন্মে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবে মনটা রয়ে গেছে। পরজন্মে হবে।"

ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি বিশ্বাস কর?"

"আমরা বৈজ্ঞানিকের জাত, আমাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

কিন্তু এত চেষ্টার পরও অনেক কিছুর উত্তর এখনও আমরা পাইনি। তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। তবে কি জান? নানা দিকের টানা-পোড়েনে ঠিক তোমার মত শক্তভাবে ধরতে পারি না।”

ওর কাছেই জানলাম, পিটার পল রুবেন্সের কৈশোর এখানেই কেটেছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে আর শরীর চলে না। আস্তে আস্তে ঝলমলে শহরের ভেতর দিয়ে ওদের, মানে রাস্তার সকলের সঙ্গে চলে গিয়ে ঢুকলাম একটা মাঝারী মত রেস্টুরেন্টে। রাতের খাবারের জন্য।

এখানে দেখলাম, যেমন এরা খাটতে পারে, তেমনি খেতে পারে, তেমনি আনন্দ করতে পারে।

এদের কাজের মেয়াদ হচ্ছে বার ঘন্টা। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা। সময় ওদের আলাদা আলাদা। কোন অফিস সাতটায় আরম্ভ হচ্ছে, কোনটা সাড়ে সাতটায়। এই জন্য রাস্তায় ভিড়ের চাপ কম। লোকেদেরও উঠতে-নামতে কষ্ট নেই। বেশ লাগল।

কলকাতাতেও এরকম 'স্ট্যাগারিং আওয়ারস' হলে মানুষের কষ্ট বোধ হয় অনেক কমে। দিল্লীতে অবশ্য কিছুটা করেছে।

আগেই ঠিক করেছিলাম পরের দিন ভোরবেলা উঠে এদের বাগান, পার্ক আর এগজিবিসন্ গ্রাউণ্ড দেখতে যাব। শহরের মধ্যে কাঠ, পাথর, সুরকি ইত্যাদির ব্যবহার, মানে বিশাল বিশাল বাড়ি ত অনেক দেখলাম।

এখন যাব চোখ জুড়োতে সবুজের সন্ধানে।

প্রথমেই গেলাম এগজিবিসন গ্রাউণ্ড দেখতে। সেইখানে দেখলাম এক বিরাট অডিটোরিয়াম। চার হাজার লোক এক সঙ্গে বসতে পারে। তা ছাড়াও আরও তিনটি ছোট ছোট অডিটোরিয়াম আছে যেমন, বারশ' নয়শ', চারশ' এত সংখ্যক লোক বসতে পারে।

তাছাড়া সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং রয়েছে। বেশ অনেক ক'টা অতি সুন্দরভাবে তৈরি। সাময়িকভাবে তৈরি করা যেমন তেমনভাবে—সে ধরনটা ওদের নেই। তাতে অযথা পয়সা নষ্ট ও পরিশ্রম নষ্ট হয়। সব

চাইতে বড় কথা হচ্ছে—দু'দিন পরে ভেঙে ফেলা হবে বলে স্বভাবতই ভালভাবে তৈরি হয় না।

এই ধরনটা কলকাতাতে অহরহ হচ্ছে। শহর থেকে দূরে অনেকখানি জমিতে সত্যি সত্যি এইভাবে এগজিবিসন গ্রাউণ্ড তৈরি যদি করা হয়, কত ভাল হয় না?

এগজিবিসন গ্রাউণ্ডের কাছেই হচ্ছে রাইন পার্ক। এ এত বড় যে তার ভেতরে ঘুরে বেড়াবার জন্য পুতুলের রেলের গাড়ির মত রেলগাড়ি আছে। তাতে চড়ে তুমি সারা পার্ক দেখে নিতে পার। তার কিছু দূরেই হরিণদের পার্ক। মানে সেখানে শুধু হরিণ আর হরিণ। মনে হয় যেন সেটা ওদেরই রাজত্ব।

কে এলো, কে গেলো ওরা বড় একটা ভ্রূক্ষেপও করে না। যেমন আমাদের দেশে কত দেশের লোক আসে যায়। সাধারণ মানুষ তা চেয়ে দেখেও না।

তবে সরকার চার চোখ দিয়ে রয়েছে। হতে পারে হরিণদের মধ্যেও সেই রকম কোন সিস্টেম রয়েছে। যাদের নজর রাখার কথা তারা ঠিকই বোধ হয় নজর রাখে।

কেন আমাদের এই কথাটা স্ট্রাইক করল জানেন? আমরা ঢোকার পর থেকেই দুটা তিনটা বয়স্ক হরিণ বিরাট বিরাট শিং নিয়ে, একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল যতক্ষণ না বেরিয়ে এলাম।

একে বললাম, "মনে হয় এরাই নজর রাখার ডিপার্টমেণ্টের হেড।"

উনি বললেন, "বয়ে গেছে হেডদের আমাদের মতন চুনোপুঁটিদের দিকে নজর রাখতে। তারা নজর রাখবে সাত আট ফুট লম্বা আমেরিকান বা আফ্রিকানদের ওপর। এরা ঐ লাইনেরই, তবে চুনোপুঁটির দল।"

বেরিয়ে এসে এই নিয়ে খুব একচোট হাসা হোল।

সন্ধ্যার দিকে শহরের মাঝখানে দোকানে দোকানে ঘুরে একটা জিনিস দেখলাম যা ইউরোপের আর কোন দেশে বোধ হয় দেখিনি।

খেলনা, কত রকমের, কত ভাবের, কত ধরনের। আমার ভাষায় তা বুঝিয়ে বলতে পারব না।

শুধু মনে হচ্ছিল, ছোটবেলায় যদি বাপ-মার সঙ্গে আসতাম তবে নিশ্চয়ই শুধু এই চাইতাম।

মেয়েকে বললাম, "কিরে মেয়ে, নিবি নাকি কিছু?"

"কি যে বল। তুমি মনে মনে কিন্তু বেশ ছেলেমানুষ রয়ে গেছ।"

"বোধ হয় তাই। তোরা অন্য দোকানগুলো ঘুরে আয়। আমি শুধু এই দেখি।" তারপর বললাম, "আমার মনে কি হচ্ছে জানিস? আবার জন্মালে যেন আমি সব সময়ই ছোট্ট থাকি। আর ততদিনে আমাদের দেশেও এই রকম সব খেলনা বানান হবে, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রোজ সকাল-সন্ধ্যা তাই দেখব।"

সে বলল, "তোমার ছেলেমানুষী আর যাবে না। এখন চল পা চালিয়ে। জিনিসপত্র নিয়ে ডুসেলডর্ফের দিকে রওনা হতে হবে। কোলনের মায়া ত্যাগ করতে হবে।"

তাই তো তাড়াহুড়ো করে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেল থেকে জিনিস নিয়ে আমাদের বন্ধুর বন্ধুদের সঙ্গে বিদায় নিয়ে রওনা হতে হবে।

॥ কুড়ি ॥

ডুসেলডর্ফের কোচে গিয়ে উঠলাম।

চারিদিকে নূতন দিনের ক্ষীণ আভাস বলাটাও বোধ হয় ঠিক হবে না। রাতের অন্ধকার তখনও রয়েছে। ইলেকট্রিকের আলো তখনও ঝলমল করছে।

তবুও কোচে উঠে বসবার আগে আকাশের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলাম, নূতনের আভাস যত ক্ষীণই হোক, তাও আছে। তারাগুলো সব আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'চারটে তখনও চোখ কচলিয়ে আগের দিনের রেশ টেনে রাখার চেষ্টা করছে।

আমারও প্রায় সেই অবস্থা। অত সুন্দর রাতটাকে আর টেনে রাখতে ইচ্ছা করছিল না। ভেবেছিলাম এই অপূর্ব রাতের কথা ভাবতে ভাবতে যাব পৌঁছে ডুসেলডর্ফে।

কোচে উঠেই কখন নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি। ডুসেলডর্ফে পৌঁছে কণ্ডাক্টারের ডাকে ঘুম ভাঙল। চেয়ে দেখলাম বাকি দু'জনেরও সেই একই অবস্থা।

এখানে আসার সময় মনে একটা কিন্তু কিন্তু হচ্ছিল, একবার বাধা পড়েছিল আগে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোচ থেকে নেমে মনটা আনন্দে ভরে গেল।

মেঘলা নয়, বৃষ্টি নয়। বুঝলাম দেশটা আমাদের ভুলটাকে মাফি দিয়ে দিয়েছে।

রেল স্টেশনে লকারে মাল রেখেছিলাম। ওখানেই রিফ্রেশমেণ্ট রুমে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে সারা দিনের জন্য তৈরি হয়ে পড়লাম। ব্রেকফাস্ট ওখানেই পেট ভরে নিলাম সেরে।

আর কি চাই? হোটেলের কথাই ভাবব যদি সারাদিন এই দেশটা দেখে শেষ করবো কি করে।

দিন হাতে গোনা : পয়সাও তাই।

তখনই মনে হোল বই আমাদের কত বড় বন্ধু, কত বড় সহায়ক। বইয়ে পড়া অনেক কিছু আছে বলেই কম সময়ে বেশী বুঝতে পারছি। চোখে দেখে বেশী উপলব্ধি করতে পারছি। আসল জিনিসগুলো বেছে নিতে পারছি।

জার্মানির মধ্যে এই শহর একটা বড় শহর হিসাবে গণ্য। বিশেষত ইন্‌ডাস্ট্রির জন্য। একে বলে "দি ডেস্ক অব দি রুর ডিসট্রিক্ট"।

এই জায়গাটা সাংস্কৃতিকদের জন্যও খুব নামী। পৃথিবীবিখ্যাত আর্টিস্ট পিটার কর্নেলিয়াস আর কবি হেন্‌রিক হাইনে এখানে জন্মেছিলেন। গোয়েটেও কিছুকাল এখানে বাস করে গেছেন। এখানকার একাডেমি অব ফাইন আর্টসের দেশ-জোড়া নাম। তাই নানা দিক থেকে আর্টিস্টরা আসে এখান থেকে নিতে ও দিতে।

আমরা প্রথমেই চলে গেলাম শহরের মাঝখানে। শহরের মাঝখানটার নাম হচ্ছে "কনিগস্ আলী"। আদর করে এখানকার লোকেরা একে বলে "কে"। এবং ডাকনাম দিয়েছে 'কো"।

এই কথাটা শুনেই আমার মনে পড়ে গেল অক্সফোর্ডের কথা। ওখানেও লোকেরা রাস্তার নামগুলোকে আদর করে ছোট করে বলে।

আমার মনে পড়ে গেল দেশের কথা। মানুষকে আমরা আদর করে ছোট নামে ডাকি। কিন্তু প্রাণহীন কোন জিনিসকে কি এই আদরটা করি? আমাদের আদর তবে কি সীমাবদ্ধ? তা কি করে হবে? যে দেশের কবি বলেছেন—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি,
বাজাও আপন সুর"

সেখানে মন, চিন্তা, ভালবাসা, কিছুরই কোন রকম সীমারেখা থাকতে পারে না।

আমারই স্মৃতিশক্তির অভাব, মনে আসছে না।

উনি বললেন, "এই মরেছে। তুমি আবার কোন্ চিন্তায় ডুব দিলে? মনের দরজায় তালা দিয়ে, চোখ দুটো খুলে পা দুটো লম্বা করে চল ত এখন।"

"ঠিক আছে। গডরেজের তালা লাগালাম।"

এ জায়গাটাতে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে নদীর জলের ধারা। তার দু'ধারে পার্ক। সেই পার্কের ধার দিয়ে রাস্তা। কি সুন্দর পরিকল্পনা করে বানান! চোখ জুড়িয়ে গেল।

সেই সব রাস্তার ধারে রয়েছে বিরাট বিরাট দোকান আর সুন্দর সুন্দর রেস্টুরেন্ট।

সেদিক থেকে এগিয়ে আমরা গেলাম "জাগেরহফ" দুর্গে। সেটা এখন হচ্ছে আর্টিস্টদের পীঠস্থান। স্থানীয় চিত্রশিল্পীরা ওখানে জমা হয়ে নিজেদের চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করে: অনেকে শেখে, অনেকে শেখায়।

"সেনটিপেডে" নামে একটা অপূর্ব মোটর চলার রাস্তা। রাস্তাটা সব কিছুর উপর দিয়ে চলে গেছে, কেন না স্তম্ভগুলোর ওপরে রয়েছে রাস্তা। আজকাল কলকাতাতেও ফ্লাই ওভার বানাতে আরম্ভ করেছে। কেমন সুন্দর হবে। কাউকে দেশ ছেড়ে যেতে হবে না এই আধুনিক সুন্দর সুবিধাজনক জিনিসটা দেখতে।

ছাব্বিশতলা "থাইসেন" বিল্ডিং দেখলাম। ঘাড় বেঁকিয়ে তলা গুনতে ঘাড়ে বেশ ব্যথা হয়েছিল। তাই সেটা কোন দিন ভুলবার নয়। এখানে সারা বছর ধরে কোন না কোন কিছুর এগজিবিশন চলছে। "ড্রুপা" ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং এবং পেপারের। তা শেষ হতে না হতেই "কুন্স্টফে" ইন্টারন্যাশনাল প্লাস্টিকের। তা যদি বা শেষ হোল তবে "ইন্টার প্যাক", মানে নানা জিনিস প্যাক করার ধারা ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কত জিনিসের যে এগ্‌জিবিশন তার শেষ নেই।

এই সব কিছুর মধ্যে সবচাইতে মনে রাখবার মত হচ্ছে "ট্রেড এগ্‌জিবিশন"। এইটা প্রথম হয় ১৮১১তে। সেই প্রথম বৎসর সবচাইতে নামী অতিথি ছিলেন নেপোলিয়ন।

এই কথাটা জেনেই কেমন যেন মনটা উদাস হয়ে গেল। আমার কয়েকজন হিরোর মধ্যে নেপোলিয়ান হচ্ছেন একজন। কত দিকে কত

প্রতিভা। এইটুকু জীবনের মধ্যে কত কিছু দিয়ে গেছেন বিশ্বকে। তাঁর শেষজীবন কেন এত দুঃখের হবে? তাঁর কপালে কেন এই পরাজয়ের কালিমা লেপে দেওয়া হবে? কেন? দেবতারাও কি মানুষদের মত হিংসুটে? কারো সম্পূর্ণ ভাল কি তারাও সহ্য করতে পারে না?

নিশ্চয়ই তাই।

বেশীর ভাগ মানুষের জীবনেই ত' শত শান্তির মধ্যে শত সুখের মধ্যে ঠিক একটু খুঁত দেখা যায়।

এখান থেকে চলে গেলাম আমরা পুরোনো শহরে। প্রথমেই গিয়ে ঢুকলাম মিউনিসিপ্যাল আর্ট মিউজিয়ামে। এখানকার সঙ্কলন সত্যিই মনে রাখার মত। ষোল শতক থেকে বিশ শতকের নামকরা পেইন্টিংস সব ওখানে রয়েছে। রুবেনসের 'ভিনাস এণ্ড এডোনিস'ও তার মধ্যে রয়েছে।

এখানে যে কত মিউজিয়াম আছে তার কোন সীমাসংখ্যা নেই। গোয়েটে মিউজিয়াম, সিটি মিউজিয়াম। এই রকম আরও অনেক অনেক। আমরা একটাতেই ঢুকেছিলাম। সব ক'টা খুঁটিয়ে দেখতে গেলে এই দেশেই জন্ম নিতে হবে।

. এই কথাটা মনে আসতেই আঁতকে উঠলাম। নিজের দেশের বাইরে কোথাও জন্মাতে পারি ভাবলেই তো মনে হয় এর চাইতে বড় অভিশাপ বোধ হয় আর কিছু হতে পারে না।

এখানকার সেণ্ট ল্যামবারটাস চার্চ আর রাউণ্ড ক্যাসল দুর্গ পুরোনো কালের স্মৃতি ধরে রেখেছে। তাছাড়া বেশীর ভাগ জিনিসই তো গত মহাযুদ্ধে বোমার চোটে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

শুধু কাঁচ ও স্টীলে তৈরি চব্বিশ তলা বাড়ি দেখলাম ওখানে। এরকমটা আর কোথাও দেখিনি।

এই অপূর্ব বাড়িটা রাইন নদীর ধারে। তাই নদীর জলে তার ছায়া সত্যিই দেখবার মত। এত ভাল লাগছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম। ঝিরঝিরে হাওয়াতে নদীর ছোট ছোট ঢেউ-

গুলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ির তলাগুলো এ ওর গায়ে পড়ে কেমন এলোমেলো দেখাচ্ছিল। যেন একতলাটা তিনতলায় উঠে তিনতলাকে একতলায় নামিয়ে দিল।

ঠিক যেমন মানুষের জীবনের কোন ঠিক ধারা নেই। যে আরম্ভ করে যেভাবে, শেষ করে বোধ হয় ঠিক উল্টোভাবে। আরম্ভের সময় সে জানে না কোথায় তার শেষ। নদী যেমন পাহাড় ভেঙে উদ্দাম ছন্দে বেরিয়ে আসে। উদ্দেশ্য সমুদ্রে পৌছান। কিন্তু সবাই কি পারে তা পৌছাতে? কোথা দিয়ে কি করে যাবে কোথায় তার শেষ তা সে কিছুই জানে না।

একটা বেশ মজার ব্যাপার দেখলাম কনিগ্‌স আলী রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে। বাচ্চা ছেলেরা চাকাওয়ালা গাড়ি নিয়ে ঠেলে ঠেলে বেড়াচ্ছে।

এই সব চাকাওয়ালা বাচ্চাদের ঠেলাগাড়িগুলোকে বলে "বাডস্লাগার"। এই বাচ্চাগুলো কিন্তু পথচারীদের কাছ থেকে কিছু পয়সা আশা করবে। এটা ওদের একটা ট্রাডিশনে দাঁড়িয়েছে। সতের শতকে তাদের বড় ভালবাসার রাজা দ্বিতীয় যোহান উইলহেল্‌ম বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন। স্বাভাবিক, রাজা যাচ্ছেন বিয়ে করতে। সে এক বিরাট মিছিল, কাতারে কাতারে লোক। চোখ-ঝলসানো জাঁকজমক।

যে গাড়িতে করে রাজা যাচ্ছেন সে তো এক স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রের রথের মত সাজে-সজ্জায়। হবে নাই বা কেন? ডুসেলডর্ফের ইন্দ্র তো রাজা যোহান উইলহেল্‌মই বটে।

প্রজারা যেন আর আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না। ঠিক সেই সময় ঘটল এক অঘটন। বরের রথের একটা চাকা ঢিলে হয়ে পড়ল। একটা দশ বৎসরের ছেলে তার সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধির জোরে সাংঘাতিক অঘটনকে রুখে দিল। নিজে সে চাকার অংশ হয়ে গেল আর চাকার কেন্দ্রস্থলকে চেপে ধরে রেখে চাকার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সারা শোভাযাত্রাটা সে গিয়েছিল।

নিজের জীবনের সে মায়া করেনি। এই শুভযাত্রায় কোন বাধা না হয় তাই ছিল তাঁর মনে।

ভগবান সব ভাল যার শেষ ভালই করেছিলেন। ছেলেটিরও কোন ক্ষতি হয়নি। রাজার ত নয়ই। এমন কি সেই বিরাট জনতার বেশীর ভাগই অনেক পরে ঘটনাটা জানতে পারে যখন রাজা ছেলেটিকে একটা সোনার মোহর উপহার দিয়েছিলেন।

আজকাল ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে প্রতি বৎসর প্রত্যেক স্টেট থেকে যেসব সাহসী ছেলে বা মেয়ে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে কোন সৎকাজ করে তাদের সম্মান দেখান হয় ও পুরস্কৃত করা হয়।

ডুসেলডর্ফের এই রাজাকেই ওখানকার লোকেরা এত ভালবাসত যে "অ্যান ওয়েলেম" বলে আদর করে ডাকত। এই রাজা তাঁর প্রজা ও রাজ্যের জন্য কত কিছু যে করেছিলেন তার সীমা পরিসীমা নেই।

দেশবাসীরা তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর আগেই ১৭১১ তাঁর নামে একটা অপূর্ব স্মৃতিস্তম্ভ বানায়। তাঁর সেই বিরাট মূর্তিটা দেখতে দেখতে একটি পথচারীর কাছ থেকে এই কাহিনী শুনলাম।

সারা দিনের এই ঘোরার ফাঁকে ফাঁকে মুখ ঠিকই চলছিল। এটাই ত মানুষের সবচাইতে অসুবিধে। মন যখন আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে হঠাৎ পেট জানান দিয়ে বুঝিয়ে দেয়—আহা কর কি, কর কি, তুমি যে মাটির লোক। ফিরে এসো মাটিতে।

ওখানে ত' কোন অসুবিধা নেই। "ভোজনং যত্র তত্র" এই প্রবাদটা বোধ হয় যিনি লিখেছিলেন তিনি পশ্চিমে এসেই লিখেছিলেন। এখানে তুমি যে-কোন জায়গাতে খেতে পার। সবই সাজানো, গোছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

অন্যথা ত হতেই পারে না। আসলে সেই যুগে আমাদের দেশটাও তাই ছিল। মানুষও ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাই মনে হয় যা ছিলাম, নিশ্চয়ই আবার তা হবার আশা আমরা করতে পারি।

আমাদের দেশে যেমন গঙ্গা, রাশিয়াতে যেমন ভল্গা, তেমনি জার্মানীতে হচ্ছে রাইন নদী। এদের বড় আদরের নদী।

একে কেন্দ্র করেই এই দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় হয়ে উঠেছে। কালচার, ঐতিহ্যে বিশ্বজোড়া নাম কিনেছে।

এই নদীর ধারে বসে লছমনঝোলার কথা মনে এলো। গঙ্গোত্রী, গঙ্গা যেখান থেকে নেমে আসছেন। ভারতবাসীরা এই গঙ্গা থেকে অনেক কিছু পেয়েছে বলেই কতভাবে কতরকমে তাকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

নদীর পারে বসে বসে বেশ সময় কাটছিল। বেশ রাতে ট্রেন। সময়ে স্টেশনে গেলেই চলবে।

একটি বৃদ্ধা জার্মান মহিলা এসে পাশে বসলেন। একাই এসে-ছিলেন। এই বয়সে এদেশে অনেকেই একা হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে নদীর দিকে আর মাঝে মাঝে বৃদ্ধার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলাম।

মহিলা নিজের চিন্তায় এতই ডুবেছিলেন যে, মনে হোল পাশে যে বসে আছি তাও যেন খেয়াল নেই। এমন কি নদীরও বোধহয় আমার অবস্থাই হয়েছে।

ওর কাছে দু'জনেই অস্তিত্বহীন।

তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল বোধহয় সারা জীবনের কত কথাই ভাবছেন—সুখের-দুঃখের, পাওয়ার, না পাওয়ার। হিসাব মেলাতে চেষ্টা করে করে বোধহয় ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছেন। জীবনের হিসাব কষা বোধহয় খুব বড় একাউন্ট্যান্টের পক্ষেও সম্ভব নয়।

যাই হোক, হঠাৎ যেন উনি বর্তমানে ফিরে এলেন।

পরিষ্কার ইংরেজীতে বললেন, "তোমরা ইণ্ডিয়া থেকে আসছ ?"

"ঠিকই বলেছ, কি করে বুঝলে? আর বেশ ভাল ইংরেজী বলছ ত ?'

"অনেক কালের কথা। কিছুদিন ইণ্ডিয়াতে ছিলাম। তাছাড়া লণ্ডনে স্বামীর কাজের খাতিরে অনেকদিন ছিলাম। তাও হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন। কবে যাচ্ছ ?"

"আজকেই রাতে।"

"রাইনল্যাণ্ডের উপকথা 'সেভেন প্রাউড বোনের কথা শোন নি?"

'তবে তাই এখন শোন। এক অপূর্ব কাহিনী। কবেকার কেউ জানে না। তবে যতদিন এই নদী থাকবে ততদিন এই কিংবদন্তী থাকবে।"

শোন বলি। শোনবার্গ (সুন্দরনগর) নামে একটা দুর্গ ছিল এই নদীর পাড়ে। সেই দুর্গে বাস করত এক কাউন্ট তার সাতটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে নিয়ে।

সেই মেয়েরা ভীষণ অহংকারী ছিল। তারা মনে করত তাদের উপযুক্ত স্বামী এই পৃথিবীতে জন্মায় নি। এমন কি রাজাও তাদের অনুপযুক্ত।

একটা খুব মস্ত দোষ ছিল এই মেয়েদের। যারা তাদের ভালবেসে বিয়ে করতে চাইত তাদের সোজাসুজি বিদায় না দিয়ে কিছুদিন ওদের আশায় ঝুলিয়ে রাখত। পছন্দ হতেও পারে, এই রকম ভাবটা আর কি। যাই হোক, পরে তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিত। তাদের মনের কষ্ট দেখে ওরা খুব আনন্দ পেতো।

সাতজন সৎ নামী জমিদার এসেছিলেন। তাঁদের ভালবাসা জানিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।

বড় বোন বলল, 'আপনাদের বিয়ে করে আমরা কি নিজেদের ছোট ও খাট করতে পারি?'

অপমানিত হয়ে তাঁরা চলে যান।

তার পর আসে সাতজন ধনী ব্যবসায়ী সেই একই আর্জি নিয়ে। দ্বিতীয় বোন তখন বলেছিল, 'তোমরা তোমাদের ধনের লোভ দেখিয়ে এসেছ কাউন্টের মেয়েদের বিয়ে করতে? বামন হয়ে চাঁদে হাত।' বণিকরা মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে গেল,—তাদের ধারণা ভুল, তারা ধনী নয়।

তারপর এল সাতজন বড় বংশের ও অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বয়স অল্প, চেহারা সুন্দর। যৌবনের প্রতীক। তারাও নিরানন্দ চেহারা নিয়ে মাথা হেঁট করে গেল ফিরে। মনে হোল, কত বৎসর যেন গেছে ওদের বেড়ে।

সাতজন বীর, সাতজন ব্যারণ, সাতজন কাউন্ট, একের পর এক এল তাদের ঐশ্বর্যের, সম্মানের জাঁকজমক নিয়ে। এমনই সেই সাত বোনের রূপের খ্যাতি, এমনই রূপের মোহ। ষষ্ঠ বোন বলল, 'আমরা কি তোমাদের চাইতে ভাল কিছু পাবার যোগ্য নই? তোমাদের ঐশ্বর্য, জমিজমা আমাদের কাছে কিছুই নয়। একে একে সকলেই অসহায়ভাবে গেল ফিরে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই এল সাতজন ডিউক। সেই একই কথা, সেই একই আবেদন ঃ

'তোমারেই আমি ভালবাসিয়াছি

কত রূপে কত বার

জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।'

একই উত্তর, 'উপযুক্ত নও, উপযুক্ত নও' বলে উঠল ছোট বোন।

এইভাবেই বোনেরা বিয়ে না করে ছিল। কিন্তু তাদের সৌন্দর্যের এত খ্যাতি ছিল বা তারা ছিল এক-একটি ডানাকাটা পরী যে তাদের বিয়ে করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লোকে আসতই। পাণিপ্রার্থীর অভাব ওদের কোনদিন হোত না। রূপের মোহ এমনি জিনিস।

শেষে এলো এক কবি। কবি নিজের কবিতা গান করত। মানে সে সুরেলা গলা নিয়ে জন্মেছিল। সে ছিল একাধারে কবি ও গায়ক। সে প্রেমে পড়ল ছোট বোনটির।

বোনেরা সবাই মিলে করল এক সলাপরামর্শ। মেয়েটি বাইরে বাইরে অভিনয় করে গেল। বেচারা কবি কিছুই বুঝল না। এমন কি একদিন মেয়েটি কবিকে একটা গোলাপ ফুলও উপহার দিল। কবি এতই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল যে পাগলের মত মেয়েটিকে উপলক্ষ করে কবিতা লিখে সুর দিয়ে গান করে দিন কাটাতে থাকে।

একদিন ছোট মেয়েটি কবিকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে। কবিও আত্মহারা। যথাসময়ে সে তার ভালবাসার পাত্রীর কাছে যায় ও তাকে গানের ভেতর দিয়ে প্রাণঢালা সুরে প্রেম নিবেদন করে।

বোনেদের আগের পরামর্শমত মেয়েটি হাসতে আরম্ভ করে ও অন্য বোনেরা লুকোন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে টিট্‌কারী দেয়।

কবি প্রাণে এত ব্যথা পায় যে ছুটে রাইন নদীর পারে এসে নদীর কাছে প্রার্থনা জানায়, যেন রাইন এর প্রতিশোধ নেয়। তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর বুকে।

এই কথা জানতে পেরে সাত বোন একচোট হেসে বলেছিল, 'যাক বাবা, বাঁচা গেল। এর কবিতা শুনে শুনে আমরা হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। ভালই হোল, রাইন নদী এখন কবির কবিতা উপভোগ করুক।'

একদিন সাত বোন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল তারপর আর তাদের দেখা যায়নি। কেউ বলে রাইন নদী প্রতিশোধ নেয়। জল হঠাৎ বেড়ে উঠে সাত বোনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আরও একটা কথা শোনা যায় যে জল-দেবতার সাতটি রাজপুত্র প্রেমহীন হৃদয়ে সাত বোনকে ধরে জলের তলে চলে যায়।

একটা আশ্চর্য কথা কি জান ?

নদীর জল যখন কমে যায়, দেখা যায় সাতটি পাহাড়। শুধু পাথর দিয়ে তৈরি। দেখে মনে হয় সেই সাত বোনের মতই পাথুরে মন নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নিজেদের সৌন্দর্যের মত্ততায়।

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এই রকম অপূর্ব কাহিনী না শুনে চলে গেলে ডুসেলডর্ফকে চেনাই হোত না। বিদায় বন্ধু"

ক্ষণিকের বন্ধুর কথা ফুরোল, কিন্তু নটে গাছটি ত' মুড়োল না।

রূপকথার রাণী রাইনের কাহিনী যে অফুরান।

॥ একুশ ॥

শেষ করার আগের কথা বলি।

কোলন থেকে সন্ধ্যেবেলা বের হবার সময় সত্যিই এক মজার ব্যাপার হয়ে গেল। এখন অবশ্য মনে হচ্ছে মজার, তখন কিন্তু মোটেই তা মনে হয় নি।

কখনও যা করা হয় নি ঠিক তাই করা হয়েছে। মানে, কোচের টিকিট কেনা হয় নি। ব্যাস, বোঝ ঠেলা।

এদিকে বিদায়ের পালা শেষ করে নেওয়া হয়েছে সকলের সঙ্গে। কোন্ মুখে এখন আবার ফিরে যাই ?

ঠিক আছে, হিসেব কষে চলার পথে যখন কাঁটা পড়ল তখন :

"ওরে সাবধানী পথিক বারেক পথ ভোল,
পথ ভোল, পথ ভুলে মর ফিরে,
ওরে সাবধানী পথিক।"

আমাদের সেই অবস্থা। চোখ, কান বুজে যে কোচটাতে জায়গা আছে তাতেই উঠে পড়লাম। কোথায় যাবে ও কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা করাতে কণ্ডাক্টার মনে হোল চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, "বন"।

"তার টিকিট দাও।"

দুটি সিট একসঙ্গে। মেয়ে সব সময় ধারের সিটে বসতে ভালবাসে। তাই তাকে ধারের সিটে বসিয়ে ওর বাবা ওর পাশে বসল।

ঠিক তার পেছনেতেই আমার সিট পড়েছিল। ধারে বসেছিলেন একটি জার্মান মহিলা বা মেয়ে যা ইচ্ছে বলতে পারেন।

ওসব দেশে মহিলা বলাটা কেউ একটা খুব পছন্দ করে না। পুরুষদের বেলাতেও তাই।

ওরা মনে যেমন কচি থাকতে চায়, বাইরের ঠাটে-ঠমকেও সেই ভাবেই চলতে চায়।

ওদেশ যে যৌবনের দেশ, বৃদ্ধের স্থানের অভাব। তাই সবাই ঠেলাঠেলি করে সে রকম অবস্থাতেই থাকবার চেষ্টা করে।

এই ভাবটা একদিক দিয়ে আমার যেমন ভাল লেগেছে, আবার মনে হয়েছে—সৃষ্টির নিয়ম কি মানুষ পুরোপুরি পাল্টাতে পারবে বা পাল্টালে ভাল হবে?

তবে মনে হয় মন যদি সজীব থাকে তবেই সে সবুজ। দেহাতীত যে মন তাই বোধ হয় আস্তে আস্তে এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধানের দাঁড়ি টানবে ভবিষ্যতে।

বসে বসে ভাবছিলাম "বন"। আচ্ছা বন নামটা কেন হোল? বিঠোভেন, পৃথিবীবিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ সতেরশ' সত্তরে ওখানে জন্মেছিলেন। সেই জন্য কি তাঁর নামের সঙ্গে মিলিয়ে শহরের নাম "বন" রাখা হয়েছিল?

ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হাসি পেল। বিঠোভেনের ত' জন্ম সেদিন, আর বনের জন্ম ইতিহাসের পাতায় দু'হাজার বছর আগে। তখন তার নাম ছিল কাসট্রা বনেনসিয়া। কোলনের বিখ্যাত ও ক্ষমতাবান শাসক অর্থাৎ প্রিন্স ইলেকটররা এই শহরে বাস করতে আরম্ভ করেন ও একে এইদিকের রাজধানীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন।

সে অনেককালের কথা। তের শতকের কথা। তারপরে কত বৎসর কেটে গেছে। পৃথিবী পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছে।

বন শহর তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই বিখ্যাত ছিল। কেউ কি কোন দিন ভাবতে পেরেছিল "বন" হবে ওয়েস্ট জার্মানীর রাজধানী?

আজ চলেছি সেই শহরে যেখানে পৃথিবীবিখ্যাত বিঠোভেন জন্মেছিলেন। আমাদের যেমন তানসেনের কথা মনে হলে মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে, ওদের কাছেও বিঠোভেন তাই। কত দুঃখের মধ্যে উনি জন্মেছিলেন। ওঁর বাবা গরীব তো ছিলেনই, আর ছিলেন মাতাল। উনি জন্মেছিলেন প্রতিভা নিয়ে। যাকে বলে প্রডিজি। এই সুযোগ নিয়ে ওঁর বাবা ওঁকে দিয়ে বাজিয়ে বাজিয়ে খুব টাকা রোজগার

করতেন আর বাচ্চাটার স্বাস্থ্যের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। উনি অল্প বয়সে মারা যান।

ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে যখনি ঘুরেছি নিজে থেকেই চট্ করে কখনও কথা বলতে আরম্ভ করিনি। এদের এই দুই জাতের মধ্যে কতকগুলো ব্যবহারে বেশ মিল আছে। সহজে কারও সঙ্গে মিশতে পছন্দ করে না। তবে যদি চান্সে ভাব হয় তবে মাঝে মধ্যে দেখেছি বেশ জমেও যায়।

গিয়েই এই স্বনামধন্য লোকের বাড়িটা দেখতে যাব এই চিন্তাটাও যেমন মনের মধ্যে হচ্ছিল আবার আর একদিকে বেশ একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

বন এক্সপেন্সিভ জায়গা। একটা রাত কাটাতে গেলেই তো টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ। দেখবার ওখানে বিশেষ কিছু নেই। ছোট্ট শহর। ঝপ করে তো পৌঁছে যাব।

যখন এই সব ভাবছি, হঠাৎ পাশের মেয়েটি সময় জিজ্ঞাসা করল। ইংরেজীতে অবশ্য। ওর ঘড়িটা আমার ভাগ্যের জোরে বন্ধ হয়ে গেছে। একেই বলে জোর কপাল। না হলে বোধ হয় কথাই হোত না।

সুযোগ পেয়ে তাড়াতাড়ি আগ বাড়িয়ে সময়টা বললাম, "আমরা ভারত মানে ইণ্ডিয়া থেকে আসছি। বন-এ যাচ্ছি। বিঠোভেনের জন্মস্থান বলে "

মেয়ে বললাম, যদিও কিন্তু আমাদের দেশ হোলে বলত যত্তো সব আদিখ্যেতা। বয়স ত' চল্লিশের নীচে হবে না, চুলে ত' পাক ধরেছে। মেয়ে, না হাতি। বুড়ি।

আমার মনটা কিন্তু এদের দেশে থেকে ও ঘুরে বেশ পাল্টে গেছে। এখনও মেয়ে বলতেই ইচ্ছে করল।

কোঁকড়ান দু'চারটি রুপোলী চুল মুখের উপর এসে পড়েছে। বয়সের, বুদ্ধির, অভিজ্ঞতার ছাপ মুখটিতে এক অন্য ধরনের কমনীয়তা এনে দিয়েছে। সুন্দর আমার পছন্দের রং মানে কমলা রং-এর গাউন পরা। বেশ লাগছিল।

আমার কথা শুনে খুব খুশী হয়ে উঠল, "কি আশ্চর্য! তুমি, মানে তোমরা বিঠোভেনের মিউজিক ভালবাস? আর আমি কিছু জানতে পারিনি। আমি ওর সুরের ভক্ত। আমি সারা জীবন বাজনা নিয়েই আছি। শুনি, শিখি আর বাজাই। কন্সার্টে বাজিয়ে অবশ্য বেশ রোজগার করি। বাবা আগে মারা গেছেন, মা অল্প দিন আগে মারা গেছেন। এখন আমি আর আমার মিউজিক।"

"বিয়ে করনি?"

"সময় পেলাম কখন? ছোটবেলা থেকেই আমি মিউজিক ভালবাসি, পাগলের মত ভালবাসি যদিও নাম তেমন করিনি। তাতে কি হয়েছে? তাই আমার মনকে ভরে রাখে।"

"যদি কখনও একা বোধ কর?"

"তখন ভেবে দেখব। অনেক মেয়ে আছে, তারা সংসার চায়, স্বামী চায়, ছেলে-মেয়ে চায়। মনে আমি স্বতন্ত্র। এই সব চিন্তা এখনও আমার মনে আসে না। তুমি বুঝি খুব মিউজিক ভালবাসা?"

"আমি মিউজিক ভালবাসি, আমি পড়তে ভালবাসি. আমি প্রকৃতিকে দেখতে ভালবাসি। তোমাদের দেশে জন্মালে কি হোত জানি না, কি করতাম জানি না। আমাদের দেশ আমাদের কম বয়সে অন্য রকম ছিল। মেয়েদের বিয়ে করতে হোত, সংসার করতে হোত। সেটাই ছিল তাদের একমাত্র করণীয়। তবে মেয়ে স্বামী নিয়ে ভালই আছি।"

আবার বললাম, "তাছাড়া এখন কিছু ভাবি না। আজকাল আমাদের দেশ তোমাদের দেশের মত অনেকটা, মেয়েদের ব্যাপারে। যাক্, এখন আমি অনেক বকে যাচ্ছি, তুমি বোধ হয় থকে গেলে।"

"মোটেই না। তোমার সঙ্গে কথা বলে বেশ লাগছে। আমাদের দেশের কোন জায়গা দেখেছ?"

"বিশেষ নয়। ফ্র্যাঙ্কফোর্ট হামবুর্গ, বার্লিন কোলন, তারপর যাবার কথা ছিল ডুসেলডর্ফে। আগে টিকিট না কাটায় এসে যাচ্ছি বনে। বনে

রাত কাটাবার ইচ্ছে ছিল না, কারণ বড় এক্সপেনসিভ। কি আর করা যায়।”

“জানি, ফরেন এক্সচেঞ্জের ঝামেলা। এক কাজ কর। প্রথমেই বিঠোভেনের মিউজিয়ামটা দেখবার চেষ্টা কোর। তাছাড়া শহরটা ঘুরে বেড়িও যেখানে আসল সরকারের অফিসাররা বা ডিপ্লোম্যাট থাকে। রাইন নদীর ধারটা সুন্দর ও দেখবার। আর এই যে যাচ্ছ যে পথ দিয়ে সেটাই ত' বন-এর সবচাইতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জায়গা ”

“অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমার এই সাহায্যের জন্য।”

“আরে, আসল কথাটাই ত' বলিনি। আমার ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। থাকি কোচ স্টেশনের বেশী দূরে নয়। কোচ স্টেশনেই রেখে দিও তোমাদের জিনিস। কাছেই থাকি। ছোট ফ্ল্যাট্। বসার ও খাবার ঘর কম্বাউণ্ড। কিচেনেট একটা, বেডরুম, বাথরুম। আমার বাড়ি এসে হাত মুখ ধুতে পার।”

“অনেক ধন্যবাদ। আমরা নেমেই দৌড়াব মিউজিয়ামের দিকে।”

“তাই ঠিক হবে। বেড়িয়ে-টেড়িয়ে ডিনার খেয়ে আমার ওখানে চলে এসো। আজ আমি অনেক রাত পর্যন্ত বাজাব। কাল সন্ধ্যাবেলা বড় কন্সার্ট আছে। তোমরা এসে আমার বসবার ঘরে বিশ্রাম নিতে পারবে। মেয়ে দরকার হলে ডিভানটা ব্যবহার করতে পারবে। আর কফি পাবে আমার কাছে। মিছিমিছি হোটেলে যাবে কেন, ভোর চারটাতে ত' কোচ ছাড়বে।”

কোচ বনে পৌঁছে গিয়েছিল। সবাই যে যার নেমে পড়ছে।

“একটু পরেই ত' দেখা হবে”, বলে মেয়েটা নেমে গেল।

ওসব দেশে, মানে, ইউরোপে সর্বত্রই একটা জিনিস শিখবার মত। এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে স্টেশন বা কোচ স্টেশন, সর্বত্রই লকার, মানে অনেকটা আমাদের ব্যাঙ্কে যেমন লকার আছে সেই ধরনের বড় বড় লকার আছে। তাতে টুরিস্টদের খুব সুবিধে জিনিস রাখার। পয়সা অবশ্যই লাগে, কিন্তু হোটেলের ঘর নেবার চাইতে লক্ষ গুণে কম।

আমরা কোচ স্টেশনেই হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে লকারে তিনটা ব্যাগ ঢুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বনগাসে মিউজিয়ামে।

বিঠোভেনের নামে ওরা কত কি যে করেছে। একটা বিরাট বিঠোভেনের হল করেছে যেখানে তাঁর সম্মানে প্রতি বৎসর সঙ্গীত সম্মেলন হয়। পৃথিবীর সব দেশের নামী মিউজিসিয়ানরা আমন্ত্রিত হয়। অবশ্য বিশেষ করে বিঠোভেনের মিউজিকই বাজান হয়।

ওখানকার রাস্তাঘাট দোকান সবই বেশ লাগছিল দেখতে। তবে যা অন্য জায়গাতে, মানে কোলন বা ফ্রাঙ্কফোর্টে দেখেছি আমার চোখে সে রকম চোখ ঝলসানো লাগেনি।

অবশ্য কথাটা আছে না—"আপ রুচি খানা"? তাই লিখলাম আমার চোখে। আর কারও লাগতে পারে।

আর একটা জিনিস নজরে পড়ল। আত্মরক্ষার্থে বানানো পুরাকালের প্রাচীর। নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা পৃথিবীর শুরু থেকে আরম্ভ হয়েছে। মানুষের সব চাইতে বড চেষ্টা। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না।

এখানকার বিরাট পার্লামেণ্ট দেখলাম।

ঘুরতে ঘুরতে শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল, এই ত' সেদিন সব ভেঙে-চুরে গিয়েছিল। আবার এরা সব গড়ে নিয়েছে। আবার তাদের ধনের অন্ত নেই। কিন্তু এই যে ঐশ্বর্য, এও কি রক্ষা পাবে?

মনে কি এদের হচ্ছে না, কবে কখন চোর সিঁদ কেটে ঢুকবে বা ডাকাত সিংহদরজা দিয়ে ঢুকবে?

কিন্তু যে ধনে ধনী হলে কেউ কেড়ে নিতে পারে না সেই ধনের চিন্তা কি এখনও করছে?

রাইন নদীর ধারে ধারে কিছুক্ষণ বেড়ালাম। বড় ভাল লাগছিল। রাজধানীর যা কিছু প্রয়োজন থাকার, সবই আছে। ঘুরে ঘুরে সবই দেখলাম।

স্বাধীন দেশ আমাদেরও। তাই কি থাকে বা প্রয়োজনীয় সে সবের নাম না বললেও আমরা সবাই তা জানি। তাই তা আর করলাম না।

তখনই বুকটা উঁচু হয়ে উঠল। আমিও স্বাধীন দেশের নাগরিক।

ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে, পরাধীনতার লজ্জা মাথায় করে আমার আসতে হয়নি।

আরও একটা কথা মনে আসাতে আত্ম-সম্মান বোধ করলাম। তোমাদের দেশ থেকে টাকা নিতে আসিনি। অতি সামান্য হলেও দিয়েই যাব। কারণ আমি টুরিস্ট। সেইখানে আমি দাতা।

অনেক কিছু দেখে ও জেনে গিয়ে ঢুকলাম অতি মাঝারী ধরনের খাবার জায়গাতে যেখানে পেটও ভরাবো, পকেটও বেশী হালকা হবে না।

সারাটা সময় আমাদের এত ভাল লাগছিল মনেই হচ্ছিল না যে বিদেশে এসেছি, আর এসেছি মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে। হঠাৎ ঐ মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়ে যাওয়াতে দেশটাই যেন চেনাজানার দলে ভিড়ে গেল।

খেতে খেতে ও তিনজনে গল্প করতে করতে মনে হচ্ছিল—তাই ত, কেউ একজন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রায় রাত সাড়ে এগারটা বারটার সময় গুটি গুটি গিয়ে হাজির হলাম মেয়েটির ফ্ল্যাটে। বেল টিপবার আগেই অতি ক্ষীণ বাজনার আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেল টিপতেই দরজা খুলে দিয়ে হেসে এসে দাঁড়াল।

"কি কেমন কাটল ?"

"খুব ভাল কিন্তু তোমাকে ত' ডিস্‌টার্ব করলাম।"

"না, এসে খেয়েই বাজাতে আরম্ভ করেছিলাম। তবেই বুঝতে পারছ কতক্ষণ ধরে বাজাচ্ছি। এই একটুক্ষণ থেকেই হয়রান লাগছিল। আমি তোমাদের কথাই ভাবছিলাম, তোমরা এলেই কফি আর রোল খাব। ঠিক সময়ে এসে গেছ। বোস, আমি কফি বানিয়ে আনছি"।

"অন কণ্ডিশন, বাসন ধোবে সব আমার মেয়ে।"

"বেশ, তাই হবে।"

আমি আগেই ভেবে রেখেছিলাম ওকে আমার দেশের একটা চিহ্ন দিয়ে যাব। তাই কোচ স্টেশনের লকারে বাক্স ঢোকাবার আগেই একটা সুন্দর মুর্শিদাবাদী রুমাল হ্যাণ্ডব্যাগে নিয়ে এসেছিলাম।

অনু ডিভানের ওপর এলিয়ে পড়েছিল। পায়ের ওপরই ত' বেশীর ভাগ সময় আমরা থাকি। সবারই প্রায় এক অবস্থা। সে জার্মান বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে সুন্দর ছোট্ট ঘরখানা দেখছিলাম।

আর্টিস্টের ঘরই বটে। সব কিছুর মধ্যেই সে ছোঁয়া যেন লেগে রয়েছে।

কফি খেতে খেতে কত কথা হচ্ছিল। ও রাজি হোল আমাদের ভায়োলিন বাজিয়ে শোনাতে। আমি ওকে রুমালটা দিতে ভীষণ খুশী হয়ে গেল।

ওদের এই ছেলেমানুষীটা আমার খুব ভাল লাগে। তখনি গলায় কি সুন্দরভাবে সে জড়িয়ে নিল।

"আমি তোমাদের বাজিয়ে শোনাব, আর তোমরা কিছু করবে না।"

মেয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, "ঠিক কথা, সবাইকে কিছু না কিছু করতে হবে। বাবা, তুমি প্লেট কাপগুলো ধুয়ে ফেলো। মা, তুমি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত কর আর তার সঙ্গে আমি একটু নাচি। আমার অনেকদিন পরে নাচতে ইচ্ছে করছে।"

"ঠিক বলেছে তোমার মেয়ে। ফিউচার ব্যারিস্টার ত।"

সে গিয়ে প্লেটগুলো ধুয়ে রেখে আসল।

"আমি চিনি গো চিনি তোমারে,
ওগো বিদেশিনী।

তুমি থাক সিন্ধুপারে,
ওগো বিদেশিনী।"

*　　*　　*　　*

আমি অতিথি তোমারি দ্বারে,
ওগো বিদেশিনী।"

গানটা গাইলাম। মানেটা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। ও সঙ্গে

সঙ্গে একটু গিটারে ঝঙ্কার তুলছিল। মেয়েরও নাচ শেষ হোল। ও আমাদের দু'জনকেই জড়িয়ে ধরল।

"তোমরা সত্যিই টেগোরের দেশের লোক। কোন সন্দেহ নেই।"

সেই রাত আমাদের সকলের কাছেই চিরদিনের সঙ্গে মিশে রইল।

শেষ